সরদার জয়েনউদ্‌দীনের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা

মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন

এক

কোনো শিল্পীই সময় ও সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। সময়, সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মর্মমূলে শেকড় সঞ্চার করে যেহেতু একজন শিল্পী লালিত ও বর্ধিত হন, সেহেতু তাঁর শিল্পকর্মে এ-সমস্ত উপকরণ অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়। কেননা সাহিত্যকর্ম দেশকাল-নিরপেক্ষ অলৌকিক বা অতিলৌকিক কোনো সৃষ্টি নয়, বরং তা' সমাজ-অন্তর্গত মানুষের চেতনা-চিত্রকল্পের শৈল্পিক প্রতিফলন। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯২৩-১৯৮৬) উপন্যাস-বিবেচনায়ও এ-সত্য প্রাসঙ্গিক। কারণ সামাজিক মানুষই তাঁর শিল্পশক্তির উদ্দীপক-শক্তি।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ছোটগল্পগ্রন্থ-প্রকাশনাসূত্রে[১] বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের আবির্ভাব। এ-সময়কালে সংঘটিত বিবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শকে করেছে গভীরভাবে প্রভাবিত। সমাজ-পরিবর্তনের দীপ্র-আকাঙ্ক্ষা হয়তো তাঁর ছিলোনা, কিন্তু যে-সমস্ত বিষয় সামাজিক শান্তি-স্থিতি-শৃঙ্খলাকে সংহত-সুন্দর অথবা বিনষ্ট করে তা' অঙ্কনেও তিনি পরাঙমুখ ছিলেন না। ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে লগ্ন হয়ে তিনি তাই তাঁর উপন্যাসে সমাজজীবনের সে-সব অসঙ্গতি চিত্রিত করেছেন, যা সময়ে-অসময়ে আমাদের অন্তর্জগৎ আলোড়িত করে, বিক্ষত ও বিপন্ন করে। যে হাঁ-অর্থক রোম্যান্টিকতাপ্রসূত জীবনবোধ উত্থান-পর্বে সরদার জয়েন-উদ্‌দীনের সাহিত্য-বিষয়ের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে, পরবর্তীতে তিনি তা থেকে মুক্ত ছিলেন একথা বলা না গেলেও অচিরেই তিনি যে অতি-রোম্যান্টিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব অতিক্রমে সক্ষম হয়েছিলেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের উপন্যাসের সংখ্যা সাত : 'আদিগন্ত', 'পান্না-মোতি', 'নীল রঙ রক্ত', 'অনেক সূর্যের আশা', 'বেগম শেফালী মীর্জা', 'শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলি,' এবং 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ'। এ-সাতটি উপন্যাসের মধ্যে 'নীল রঙ রক্ত' ব্যতীত অপর ছয়টি উপন্যাস সমাজ ও সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ-নির্ভর। সরদার জয়েনউদ্‌দীন 'আমাদের নিষ্ঠাবান ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা এবং সমাজচেতনা প্রবল। তিনি সামাজিক মানুষকে ইতিহাসের পটে রেখে তাদের অন্তরস্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। এতে তিনি সফলতা লাভ করেছেন বহুল পরিমাণে।'[২] তাঁর শিল্পবোধের মৌলপ্রবণতা ছিলো মানবকল্যাণ। যুদ্ধ, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা আর অনৈতিকতাকে তিনি ঘৃণা করেছেন, এবং সে-অনুযায়ী উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র সৃজন করেছেন। তাঁর উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে।

দুই

শিল্পকৃতির দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও 'আদিগন্ত' (১৯৫৬) সরদার জয়েনউদ্‌দীনের জীবনবোধের কেন্দ্রস্থ সত্যস্পর্শী। সমাজসমস্যা-মূলক এ-উপন্যাসে লেখক কাহিনী-বর্ণনায় গতানুগতিক শিল্পকৌশল অনুসরণ করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী লেখকের গ্রামীণ জীবনাভিজ্ঞতা-নির্ভর। অবশ্য অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন-জটিলতা ব্যক্ত করবার জন্য যে-শিল্প-শক্তির প্রয়োজন, তা' এ-পর্যায়ে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের ছিলো অনায়ত্ত।

'আদিগন্ত' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সমাজ-পরিসরকে কেন্দ্র করে। এ-সময় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন ছিলো দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ, ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত। সরদার জয়েনউদ্‌দীন বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এ-জটিল ও বহমান ধারাকে পশ্চাৎপটে স্থাপন করে 'আদিগন্ত' উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করেছেন এবং সমাজসত্যের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। উপন্যাসের স্থানিক প্রেক্ষাপট হিসেবে গৃহীত হয়েছে পাবনা জেলার এক অখ্যাত পল্লীগ্রাম নবীনগর। উপন্যাসের সূচনাদৃশ্য শুধু চিত্তাকর্ষকই নয়, লেখকের সমাজ-দৃষ্টি উদ্‌ঘাটনেও গুরুত্বপূর্ণ :

পাকশী ব্রিজের ভিতরে যে নদী সুঁইয়ের মধ্যে সূতার মত হইয়া প্রবেশ করিয়াছে, রাতদিন দুঃসহ মরণ যন্ত্রণায় তড়পাইয়া মরিতেছে, কে কল্পনা করিতে পারে, সেই মৃতপ্রায় পদ্মা পঞ্চাশ মাইল দূর অবধি আগাইয়া আসিতেই এক মহা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিবে। এপারে পাবনা ওপারে নদীয়া-ফরিদপুরের গাঁও গ্রাম, দুইধারে দুই সীমানাকে আকাশ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া চার পাঁচ মাইলব্যাপী প্রলয়ঙ্করী পদ্মার কি উথাল-পাথাল, কি মেঘগর্জনের লীলাখেলা!... মনে হয় অজানা-অদেখা অজগর সাপ যেন রাতদিন রোষভরে গর্জন করিতেছে, ক্ষুধা পাইলে চোখের পলকে গ্রামকে গ্রাম খড়-কুটার মত পেটের কোন অতল তলে হজম করিয়া লইবে, বর্ষার পদ্মার কি অভিনব রূপ।...

আর এক রূপ আছে তার, শীত-বসন্তে। প্রমত্তযৌবনা পদ্মা তখন শীর্ণা, বিগতযৌবনা বধূ। সৌম্য, শান্ত। মুখে তার কুলু কুলু কুল ভাঙ্গা নদীয়ার গান, অঙ্গভরা সোনালী অলঙ্কার—সোনা ঝলমল ধান, বুকে তার পিঠা-পায়েসে নবান্নের আমন্ত্রণ। আঙিনায় আঙিনায় সারী-জারী, বাউল-ভাটিয়ালী গানের আনন্দ থৈ থৈ। আজব এদেশের মাটির মানুষ। শস্য ফলায়, খায়, প্রাণ ভরিয়া গান গায়—পৈতা নিলে বামন চিনি, বামনী চিনি কি প্রকারে ... লালন কয় তোর জাতের ভড়ং...। উদাসী বাউল মনের আনন্দে এ-দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে গান গাহিয়া ফেরে।

এলো যুদ্ধ...এলো দাঙ্গা...।[৩]

মনে হয় লেখক পদ্মা-তীরবর্তী মানুষের সংগ্রামশীল বাস্তবতার স্বরূপ অঙ্কনের জন্য উপন্যাস-কাহিনীর এ-পূর্ব-আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সংযোগ না ঘটায় লেখকের আয়োজন সফল হয়ে ওঠেনি। যার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক-কাহিনীতে পার্শ্ব-প্রসারণ ঘটেছে, এবং সামাজিক বাস্তবতাও পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে উপস্থিত হতে পারেনি। যুদ্ধ এবং দাঙ্গার ফলে সামাজিক মানুষ কিভাবে ক্রমশঃ বিপন্ন ও উন্মূলিত হয় তা' চিত্রিত না করে লেখক অত্যন্ত সাদামাটা উপকরণ নিয়ে উপন্যাসের কাহিনীমূলে প্রবেশ করেছেন।

নবদ্বীপ থেকে তীর্থশেষে প্রত্যাবর্তনের পথে সারদা ও নরোত্তম বোরেগী উপস্থিত হন নদীয়া জেলার এক প্রত্যন্ত পল্লীতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দুষ্ট প্যারাসাইটে আক্রান্ত এ-গ্রাম জনমানবশূন্য। এতদ্‌প্রসঙ্গে লেখক দাঙ্গা-কবলিত নিস্তব্ধ গ্রামকে অঙ্কন করেছেন এভাবে :

> ...না, জন-মানুষের কোন সাড়া-শব্দ নাই, অথচ এই ছিল বলিয়া মনে হয়। কেমন যেন তচনচ ভাব, সব এলোমেলো অগোছালো হইয়া ছড়াইয়া আছে।...সব বাড়িতেই একই অবস্থা। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে শ্মশানের মত নিস্তব্ধতা। কেবল এখান-ওখান হইতে ঝিঁঝির একটানা ঝিঁঝি শব্দ তীরের ফলার মত আসিয়া সে নিস্তব্ধতাকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিয়া কোন্ দূরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।[৪]

এ-হৃদয়স্পর্শী বর্ণনার পর লেখক তার অসাম্প্রদায়িক চৈতন্যদৃষ্টি সঞ্চারিত করে দেন ভক্ত বৈষ্ণব-দম্পতির কথোপকথনের মাধ্যমে :

> কিন্তু এটা যে মুসলমানের বাড়ি সারদা, আসতে বাহির বাড়িতে মসজিদ দেখলাম। সারদা কহিল, যে বাড়িতে মানুষ নেই তা আবার মুসলমান আর হিঁদু,...[৫]

নিঃসন্তান এ-বৈষ্ণব-দম্পতি রাত্রির অন্ধকারে এই দাঙ্গাবিধ্বস্ত গ্রামের রক্ত-জমাট একটি ঘরে কুড়িয়ে পায় পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স্ক ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে। সাম্প্রদায়িক পশুশক্তির হিংস্রতা তাকেও নিষ্কৃতি দেয়নি। এই মেয়েটিকে সঙ্গে করে অবশেষে নরোত্তম—সারদা চলে আসে স্বগ্রাম নবীনগরে। মেয়েটির নাম সরলা। নরোত্তমের প্রতিবেশী জোনাব মণ্ডলের পুত্র মেহেরের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার গড়ে ওঠে হার্দ্যসম্পর্ক।

একদিকে যুদ্ধ-দাঙ্গা, অন্যদিকে পাকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষায় তখন সারা দেশ উত্তেজিত। নবীনগরের সাধারণ জনগোষ্ঠীও এ-উত্তেজনা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। যুবক মেহেরও তাদের একজন। নৌকাবাইচ আর জারী-সারী গানের 'দোহারকী' করে তার সময় অতিবাহিত হলেও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অলীক স্বপ্নে সেও আক্রান্ত হয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনাভঙ্গি থেকে সেও গেয়ে ওঠে :

> ও-ও দেশের হিন্দু-মুসলমান বাংলাদেশে কায়েম কর সোনার পাকিস্তান।[৬]

সাধারণ মানুষের এ-সংগ্রামকে সম্বল করে এ-সময় এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী পরগাছার মতো গজিয়ে ওঠে। মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিভূমিতে এরা ছড়িয়ে দেয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। ব্রিটিশ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এরা অবলীলায় চালিয়ে যায় মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ। দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর নেমে আসে জেল-জুলুম-অত্যাচার-হুলিয়া। 'আদিগন্ত'-এর ছামাদ পণ্ডিত এদেরই একজন। জনকল্যাণকর্মে উৎসর্গ এ-মানুষটি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য জোতদার-মহাজনের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ...ছামাদ পণ্ডিত একটা উড়নচণ্ডী লোক, না হইলে ১৩২৬ সালে যে লোক বি. এ. পাস করিয়াছিল, সে এতদিন আর না হইলেও জজ-ম্যাজিস্ট্রেট তো হইতে পারিত, তাহা না করিয়া কিসের খেলাফত, কিসের কংগ্রেস করিয়া করিয়া জীবনটা উচ্ছন্ন করিয়া দিল।[৭]

কিন্তু ছামাদ পণ্ডিত সম্পর্কে নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ :

> জজ-ম্যাজিস্টর হয়তো হইতো, কিন্তুক ... গরীবের বন্ধু হইতো না। ... কথাতো আর সে খারাপ বলে না, যা কিছু বলে আমাগো ভালর জন্যিই বলে। ... আমাগরে চাষার দল নিয়ে কমিটি করিছিল, যে চাষ করবি সে পাবি দুই ভাগ, জমিওয়ালার এক ভাগ, ওই নিয়ে বাঁধলো ফচাদ। সেই কেসেই তো সব জমিওয়ালা একদিক হয়ে জেলে ফাঁসায়া দিল পণ্ডিতেরে। ... পণ্ডিত সোনার মানুষ, গরীবের বন্ধু।[৮]

অত্যন্ত স্বল্পকথায় লেখক আমাদের চৈতন্যের স্মৃতিময় প্রান্তরে ছড়িয়ে দেন সেই তেভাগা আন্দোলনের কথা, যে-আন্দোলন এ-দেশের ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়কে দিয়েছে মুক্তির ইশারা। এ-আন্দোলনের সক্রিয় সংগ্রামী ছামাদ পণ্ডিত তাই হয়ে ওঠে নির্যাতিত বিশাল মানবসম্প্রদায়ের মুক্তিদূত; গর্ব আর গৌরবের একান্ত সহচর। মেহের ও সরলা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। প্রতিবেশসূত্রে প্রাপ্ত বৈষ্ণবীয় উদার প্রেমের সঙ্গে ছামাদ পণ্ডিতের মানব-প্রেমাদর্শের স্পর্শ সরলা-মেহেরকে সংকীর্ণ ধর্মভাবনা থেকে মুক্ত করে। সারদার উদার স্নেহে মাতৃহীন মেহের বিস্মৃত হয় তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট, অপমান ও গ্লানি :

> দয়া মায়া স্নেহ মমতা এসব মনের জিনিস, সংসারের সব বাঁধনের উপরে। দেখ মেহের, তুই ভিন জাতের ছেলে। কিন্তু জাত দিয়ে

মানুষ নারে, মানুষ দিয়েই জাত। তাই যে আসল মানুষ তার কাছে জাতির বিচার নাই।[৯]

কিন্তু সংসারের সমস্ত মানুষই সারদা-নরোত্তম-ছামাদ পণ্ডিত নয়। সমাজ-সংসারে প্রতিক্রিয়াশীল ঘৃণ্যশক্তি সক্রিয় বলে এ-সংসার সময়ে-অসময়ে হয়ে ওঠে বিষাদ-তিক্ত। সরদার জয়েনউদ্‌দীন 'আদিগন্ত' উপন্যাসে সমাজজীবনে বিরাজিত সে-সব খল চরিত্রের স্বরূপও উন্মোচন করেছেন যারা জগৎ-সংসারের সামগ্রিক বিশৃংখলার জন্য দায়ী। 'আদিগন্তে'র মীর খোরশেদ, দারোগা লস্কর আলী তালুকদার সে-অশুভ শক্তি, যাদের ঘৃণ্য দর্প ও দাপটে বিপর্যস্ত হয়েছে সামাজিক শৃংখলা। মুখে এদের ধর্মভক্তির গুঞ্জরণ অথচ অন্তর-কোটরে উদ্যত হয়ে আছে অশুভ কালসাপ। মীর খোরশেদের চারিত্র-স্বরূপ উদ্‌ঘাটনসূত্রে মেহেরের ভ্রাতৃবধূ সোনাজানের আত্মকথন এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> উঃ লোকটা কি ভয়ানক কালকেউটে সাপ! সেদিনের কথা সোনাজানের আজও মনে পড়ে। ... মীর সাহেব পরহেজগার লোক, দুই-দুইবার মক্কা শরীফ হইয়া আসিয়াছেন। এখন আল্লার নামে জান সাদকা করিয়া দিয়াছেন, তাই দোওয়া-দরুদ আর কলমা নামাজ লইয়াই বেশী ব্যস্ত থাকেন। দেশের লোক ছাড়েনা তাই মুরিদ করিতে হয়, লোকে ছাড়েনা তাই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসি-ডেন্ট হইয়া সালিস-বিচার করিতে হয়। ... তাই পীরসাহেব সংসারে অনাসক্ত হইয়াও সংসার-ধর্মে কিছুটা মন দিয়া আছেন।...
>
> সোনাজান পেটের বেদনায় চীৎকার করিতেছিল। পীর সাহেব একনজর দেখিয়াই বলিলেন, জ্বীন, জ্বীনে পাইয়াছে। তারপর পীর সাহেবের আদেশে ঘর নিকানো হইল। পীর সাহেব কোরান হাতে তেলাওয়াত করিতে করিতে সে ঘরে ঢুকিলেন। ... তার-পর, তারপর কি হইয়াছিল, জানে সোনাজান, আর এই শয়তান পীর।[১০]

মানুষের দুর্বলতার সুযোগে এ-কূটবুদ্ধি সমাজ-শাসকেরা যে কিরূপ স্বার্থপর ও অবৈধ প্রণয়পিপাসু হয়ে ওঠে তা' উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্ট। এ-বর্ণনায় শুধুমাত্র মীর খোরশেদের চারিত্রিক অসঙ্গতিই নয়, একটি অশিক্ষিত,

অনগ্রসর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনপদের চিত্রই সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ-সমাজ যুক্তিহীন, বিজ্ঞানবুদ্ধিবর্জিত। মীর খোরশেদের মতো অশুভ শক্তিই এ-সমাজের চালিকাশক্তি।

মীর খোরশেদের যাবতীয় অপকর্মের প্রভাবক-শক্তি শরিফা। শরিফা শুধু তার পরিচারিকাই নয়, দুষ্কর্মের সহযোগী ও মন্ত্রণাদাত্রীও। দারোগা লস্কর আলী তালুকদারও মীর সাহেবের একজন সচেতন দোসর। এদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে মেহের-সরলার প্রেমময় সম্পর্ক সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়। সমাজ-শোধনের নামে মীর খোরশেদ মেহের-সরলাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে প্রয়াস পায়। অথচ এই মীর সাহেবই শরিফার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়-কর্মে লিপ্ত। শুধু শরিফাই নয়, তিনি সরলাকেও এপথে টেনে আনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং এ-কার্যে নিয়োগ করেন শরিফাকে। অবশেষে একদিন—'পীর সাহেব সরলার হাত ধরিয়া বুকে টানিয়া লইতে উদ্যত হইলেন। সরলা জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পীর সাহেবকে ধাপা দিয়া হটাইয়া দিল।' সরদার জয়নউদ্‌দীন সমাজ-সংসারে বিচরণশীল এ-ধর্মধ্বজীদের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন সরলার দৃষ্টিকোণে :

> কি সাংঘাতিক লোকরে বাবা ; পীর-দরবেশের মত জুব্বা চাপকান গায়, টুপি মাথায়, হাতে তস্‌বী নিয়ে রাত-দিন যে লোক আল্লার নাম জপ করে, সে কিনা তলে তলে শয়তানের গোড়া, বদমাইসের ওস্তাদ।[১১]

কূটবুদ্ধি মীর খোরশেদ সরলাকে অধিগত করতে না পেরে ভিন্নতর উপায় উদ্ভাবন করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরের পরিবর্তে ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সরলার বিবাহসংঘটনে উদ্যোগী হয় নরোত্তম বোরেগী। কিন্তু বিবাহের রাত্রেই খুন হয় সরলার পাণিপ্রার্থী মাধব দাস। এ-খুনের সূত্র ধরে মীর খোরশেদ তার হীন প্রত্যাশা পূরণে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তার এ-উদ্যোগের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দারোগা লস্কর আলী তালুকদার। মেহের-সরলা-নরোত্তম-সারদার জীবন নিক্ষিপ্ত হয় চরম অনিশ্চয়তায়। এ-পর্যায়ে সরদার জয়েনউদ্‌দীন প্রশাসন-প্রভাবিত বিচার-ব্যবস্থার দৈন্যদশা চিত্রণে প্রয়াসী হয়েছেন :

> ...দারোগা লাশের সহিত মেহেরকে সদরে, ...সরলাকে চৌকিদারের হাওলায় থানায় চালান করিয়া দিয়া সাক্ষী-সাবুদ ঠিক করিবার জন্য পীর সাহেবের সহিত আলোচনায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

> অনেক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হইল, মূল সাক্ষী শরিফা, কেরামত, নরোত্তম আর খোকা ভুঁইমালী, আরও পাঁচসাত জন সাক্ষীও ঠিক করা হইল, তাহার একজন হইলেন প্রেসিডেন্ট পীর সাহেব। ইহাও ঠিক হইল, নরোত্তম সাক্ষ্য না দিলে তাহাকে ও সারদাকে আসামীর তালিকাভুক্ত করা হইবে।[১২]

অর্থ ও প্রতিপত্তিনির্ভর এ-বিচারব্যবস্থায় এ-ভাবেই সর্বস্বান্ত হয় সহজ-সরল সামাজিক মানুষ। 'আদিগন্তে'র সরলা সম্ভ্রম নিয়ে কোনোমতে টিকে থাকে। নরোত্তম সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব-সমাধানে ব্যর্থ হয়ে আদালত প্রাঙ্গনেই ইহলীলা সংবরণ করে। মেহের অবলীলায় স্বীকার করে নেয় কায়িক শ্রমসহ দশ বৎসরের দণ্ডাদেশ।

অবশেষে মীর খোরশেদের দীর্ঘদিনের নিখাদ সহযোগী শরিফার চৈতন্যোদয় হয়। নিজের জীবনের বিপন্ন ইতিহাস বিশ্লেষণের সূত্রে সে শুভ-অশুভের পার্থক্য অনুধাবনে সক্ষম হয়। সাধ্বী সরলাকে ব্যভিচারের বেষ্টনী থেকে উদ্ধার করতে সে উদ্যোগী ভূমিকায় এগিয়ে আসে। সদ্য কারামুক্ত ছামাদ পণ্ডিতের পত্রসহ পাবনা কোর্টের একদা বিখ্যাত উকিল বাদশা মিয়ার শরণাপন্ন হয় সরলা-শরিফা। বাদশা মিয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টায় জেল-জীবন থেকে মুক্ত হয় মেহের।

উপন্যাসের সূচনায় যুদ্ধ এবং দাঙ্গার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলেও পুরো উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে তার প্রভাব আদৌ লক্ষ্য করা যায়নি। উপন্যাসের প্রায়-সমাপ্তিতে ছামাদ পণ্ডিত এবং উকিল বাদশা মিয়ার কথোপকথনে এতদসম্বন্ধীয় যে ইঙ্গিত আছে তা' ঔপন্যাসিক-ঘটনার পক্ষে আরোপিত বলে মনে হয়। ছামাদ পণ্ডিতের ভাষায় :

> ...সমাজ জীবনে যুদ্ধের পর থেকে যে অর্থনৈতিক দুষ্ট কীট প্রবেশ করেছে, তাকে যেন ঔষধ দিয়ে সারানো যাবেনা বলেই মনে হচ্ছে। এ যে কি অনাসৃষ্টি তা পাড়াগাঁয়ে ক'দিন বাস না করলে বুঝবার উপায় নাই। শোষণে শাসনে আর দুর্নীতির অমানুষিক চাপে সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। এরা যে আবার কোনদিন এ ভগ্ন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবে তার যেন আর আবার আলোক দেখতে পাইনা।[১৩]

বাদশা মিয়ার বক্তব্যও এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> একথা ভুললে চলবে কেন যে, অনাচার-অত্যাচার যারা করে তারা একজাত, আমরা একজাত। এ অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, সেটা সত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবেই।[১৪]

কিন্তু সম্পূর্ণ উপন্যাসে অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো সংগ্রামের ইঙ্গিত নেই। ছামাদ পণ্ডিত প্রতিবাদী, কিন্তু উপন্যাসের কোথাও তাঁর প্রতিবাদ অর্থবহ তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। মেহেরের সমস্যাও একান্তভাবে হৃদয়ঘটিত। সমাজ-পরিবর্তন-সংক্রান্ত অঙ্গীকার তার মধ্যে ছিলো কিনা, সে-রকম কোনো বিবরণ উপন্যাসে নেই। তদুপরি যুদ্ধ এবং দাঙ্গার ফলে সমাজজীবনে কোনো ভিন্নমাত্রার উদ্ভব ঘটেছে কিনা এতদ্‌-সম্বন্ধীয় তথ্য উপন্যাসে সংযোজন করতে ব্যর্থ হয়েছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন। ঔপন্যাসিক-ঘটনার পার্শ্ব-প্রসারণই মূলত এজন্য দায়ী। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, 'আদিগন্ত' উপন্যাসে সরদার জয়েনউদ্‌দীন অন্ততঃ লোককান্ত হওয়ার অভিলাষ বর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তবু এ-পর্যায়ে যে-সমাজ অস্পষ্ট ও খণ্ডিত, কালক্রমে যে তা' স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে, সে-প্রত্যাশায় আমরা অপেক্ষমান।

তিন

'পান্নামোতি' (১৯৬৫) কালানুক্রমিক দিক থেকে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের দ্বিতীয় উপন্যাস। এ-উপন্যাসে 'ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অন্ত-অসঙ্গতি এবং লুপ্তপ্রায় দাই-সম্প্রদায়ের জীবন-যন্ত্রণা'র[১৫] চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নব্য ধণিক-শ্রেণীর উদ্ভবের যে-ইতিহাস, সে-ইতিহাসের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে এ-উপন্যাসের কাহিনী-সংগঠনে। এ-উপন্যাসে দুটো কাহিনী সমান্তরাল-ভাবে বহমান। একটি কাহিনীতে পাবনা জেলার এক অখ্যাত গ্রাম চন্দন পুরের সামন্ত-প্রতিনিধি শক্তিপদ চৌধুরীর জীবনযন্ত্রণার সামূহিক জটিলতা চিহ্নিত হয়েছে, অন্যটিতে দাই-সম্প্রদায়ের পেশা-পরিবর্তন এবং অভিশপ্ত জীবন চর্যার স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে। এ-দুটো কাহিনী পরিশেষে মিলিত হয়েছে একটি মোহানায় এবং উপন্যাস-কাহিনীকে দিয়েছে পূর্ণতা।

'পান্নামোতি' উপন্যাসে সরদার জয়েনউদ্দীন সামন্ত-সমাজের হতবল-প্রতিনিধি শক্তিপদ চৌধুরীর ক্ষয়িষ্ণু চিত্র চিত্রিত করবার পূর্বে তাঁর পরিবার বা বংশপত্তনের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন :

> রায়বাহাদুর কালীনাথ চৌধুরীর পিতা ঘনশ্যাম দোবে ছিলেন সাধক। বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করতে করতে এদেশে এসেছিলেন, লোটা কম্বল সম্বল করে সেই মধ্য ভারতের রাজপুতনা থেকে। এখানে এসে ওই সামনের মন্দির বাড়ীর বটতলায় অনাহারক্লিষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।...জনশ্রুতি আছে, হঠাৎ মায়ের নাকি আদেশ হলো, ঘনশ্যামরে! আর কতকাল উপবাসে থাকি বল, যুগ যুগ বছর কেটে গেল এখানে এই বটতলার জঙ্গলে, নিরম্বু, নি-জবা পড়ে আছি। বড় ক্ষুধার্ত—বড় মন-পীড়িত আমি। সকাল সন্ধ্যা দুটো জবা দিস আমায় তাতেই খুশী হবো।
>
> ...ঘনশ্যামের হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠলো। আর কালক্ষেপ না করে পাশের দাই-বাড়ী থেকে একখানা দা চেয়ে নিয়ে এসে বট-তলার ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করতে লেগে গেল ঘনশ্যাম। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম শেষে মাকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে ওই বট-তলায়ই প্রতিষ্ঠা করলো। ...প্রথমদিন কেবলই ফুল, পরের দিন ফুলচন্দন, তার পরদিন ভোগ এমনি করে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগলো। আর এ থেকেই একদিন রাজাবাবুদের তালুক, জমিদারী, লোক-লস্কর, শেষে রায়বাহাদুর খেতাব।[১৬]

সাধক ঘনশ্যাম দোবে অব্যাহত শ্রমে ও কর্মে একদা যে-বংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন, সমাজপরিবর্তনের বহমান ধারায় আজ তা' বিলীয়মান। শক্তিপদ চৌধুরীর শক্তি আজ নিঃশেষপ্রায়। এ সর্বনাশের মূলে ছিলেন শক্তি-পদ চৌধুরীর পিতা বিশ্বনাথ চৌধুরী, যাঁর কাছে তালুক আর জমিদারীর পাশাপাশি নারীসঙ্গও হয়ে ওঠে প্রিয়-বিষয়। তাই চৌধুরী-পরিবারের দয়াদাক্ষিণ্যে প্রতিপালিত দাই-নারীদের দিয়েই জৈব-লালসা চরিতার্থ করতেন তিনি। এতদ্‌প্রসঙ্গে যে জনশ্রুতি রয়েছে তা' উল্লেখযোগ্য :

> ...দাই বাড়ীর চেহারার সাথে নাকি রাজাবাবুদের চেহারার অনেক মিলও রয়েছে। অমৃত দায়ানীর মা পিয়ারী নাকি বিশ্বনাথ চৌধুরীর সময় রাজাবাবুদের সবেসর্বা ছিলেন। তার হুকুম ছাড়া অন্দর

> দূরের কথা, সেরেস্তার কায়কারবারতক অনেক সময় অচল থাকতো, কুটোটি নড়তোনা।[১৭]

পিয়ারীর মৃত্যুর পর অমৃত দায়ানীও চৌধুরী পরিবারের আনন্দ-উপভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পিতা বিশ্বনাথ চৌধুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন শক্তিপদ চৌধুরী। অমৃত দায়ানীকে তিনি অর্জন করেন ভোগের উপাদান হিসেবে। এজন্য শক্তিপদ চৌধুরী যে অপকৌশল অবলম্বন করেন তা' যেমন কালিমা-কদর্য, তেমনি মর্মান্তিক :

> পিয়ারীর একই মেয়ে অমৃত। তাই ঘরছাড়া বাইরে বিয়ে হ'লোনা।... শক্তিপদই তালবাহানা করিয়ে অমৃতকে ঘরজামাই বিয়ে দিল, ওদেরই পেয়াদা খোঁড়া লালনের সাথে। বিয়ের পর থেকে লালন সারাজীবন অসুখে ঘরে শুয়েই কাটিয়ে গেছে। তবু অমৃতের সন্তান হয়েছিল দু'টি--বিশু আর পান্না। ...আর সে অসুখটা হ'লোই বা কিসে তা লোকে লালনের মুখে শুনেছে। একদিন রাতে লালন বাবুদের বাড়ী ঠাকুরের প্রসাদ পেল, নেশাভাং করলো, তার-পর টলতে টলতে এসে একসময় ঘরে শু'লো। সেই যে শু'লো আর কোনদিন উঠে বসলোনা। এ নিয়ে অমৃত কোনদিন রাজাবাবু-দের দোষারোপ করে নাই। ...লালন ব্যথাতুর চোখে তাকিয়ে থাকতো অমৃতের দিকে। কত কথা, কত বেদনা, কত নালিশ তার মুখে চোখে ভেসে বেড়াতো। তারপর একদিন সংসারের মায়া কাটিয়ে অমৃত ও শক্তিপদ চৌধুরীকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পাল টাঙিয়ে চলে গেছে সে।[১৮]

এই প্রকাশ্য, অথচ অসম জীবনযাত্রার পরিণাম সুখকর হয়নি। তাই চৌধুরী পরিবারের পতনধ্বনি ক্রমশঃ নিকটতর হয়ে আসে :

> ... আজ রাজাবাবুদের থাকার মধ্যে আছে তেলোটাক খানেক তালুক, আর ওই রাজাবাবুদের বাড়ী নামটা। তাছাড়া কোথা দিয়ে কেমন করে কখন যে সব শক্তি সামর্থ্য, দাপট আর জোত-জমি বেরিয়ে গেল টেরও পাওয়া গেলনা। তবে শক্তিবাবুর ছোটভাই ধ্রুব চৌধুরী যখন রাজা সেজে যাত্রা দলে পাঠ করে, তখন সবাই বলে, হ্যাঁ রাজাই বটে। যেমন চেহারা, তেমনি বলার ভঙ্গি। কেউ কেউ

বলে, হবে না রাজ বংশেরই তো ছেলে—রাজাদেরই রক্ত যখন গায় তখন তো হবেই। এইটুকুই মাত্র, আর সব—সব গেছে নিঃশেষ হয়ে।[১৯]

যে অবৈধ জীবনযাপনপ্রণালী চৌধুরী পরিবারের গৌরবময় ঐতিহ্যে কালিমা লেপন করেছে, তা' কখনও কখনও চেতন-অবচেতনে তাদের ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে। একদিন যারা মাথা উঁচু করতে ত্রস্ত ও কম্পিত হতো, আজ তারা অবলীলায় চৌধুরী পরিবারকে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে না। এরকম একজন অভিযোগকারী বিশু; অমৃত দায়ানী আর শক্তিপদ চৌধুরীর অবৈধ মিলনে তার জন্ম। জন্মকলঙ্কের অনুভবজাত বিক্ষোভ-বেদনা নিয়ে সে শক্তিপদ চৌধুরীর মুখোমুখি হয়। বিশুর অভিযোগের প্রচণ্ডতায় শক্তিপদ চৌধুরী দিশেহারা হয়ে ওঠেন।

চৌধুরী পরিবারের অবশিষ্ট সন্তান ধ্রুব চৌধুরীও বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন। যাত্রাদল নিয়েই অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসে ধ্রুব চৌধুরী। একসময় সে আকৃষ্ট হয় অমৃত দায়ানীর গর্ভজাত এবং অগ্রজ শক্তিপদ চৌধুরীর ঔরসজাত কন্যা পান্নার প্রতি। কিন্তু জন্ম-কলঙ্কের বেদনায় যন্ত্রণাদগ্ধ ও অন্তর্গত রক্তক্ষরণে ক্ষতবিক্ষত পান্না প্রত্যাখ্যান করে ধ্রুব চৌধুরীকে। প্রত্যাখ্যানের অপমান সহ্য করতে না পেরে সে হয়ে পড়ে সংসার-বিবাগী। অবশ্য পিতা বিশ্বনাথ চৌধুরী এবং ভ্রাতা শক্তিপদ চৌধুরীর মতো অবৈধ প্রণয়কর্মে বিশ্বাসী নয় ধ্রুবচৌধুরী। তাই সে নির্দ্বিধায় বলে :

...না না না, যাকে ভালবাসি তার যেন অমর্যাদা না করি, ভালবাসায় যেন কলঙ্কের ছোঁয়া না লাগে।[২০]

অবশ্য ধ্রুবচৌধুরীও জানে পান্নার কলঙ্কময় জন্ম-ইতিহাস—'জানে, সে তার নিজের বড় দাদার রক্তে গড়া মানবশিশু'। একদিকে সংবেদনজাত প্রত্যাশা, অন্যদিকে সুকঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে ধ্রুব চৌধুরী তাই হার্দ্যজগতে নিপীড়িত হয়; তবু পান্নার রূপসুধা পান করবার আকাঙ্ক্ষায় সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এবং তাদেরই অনুগ্রহ-ধন্য দীনুকে নিঃসঙ্কোচে ও নির্দ্বিধায় বলে :

...ধরো আমি যদি মুসলমান হই তবে পান্নাকে তোমরা আমার হাতে দিতে রাজী হবে?[২১]

কিন্তু দীনু জানে জাত-বদলই মূল কথা নয়, রক্ত-সম্পর্কটাই আসল :

> জাত বদলালে কি শরীলের রক্তও বদলে যাবেন নাকি, আর তোমার সাথে যে সম্বন্ধটা আছেন সেটাও কি পালটে যাবেন না তা কোনদিন যেয়ে থাকেন ?[২২]

এভাবেই প্রণয়-প্রত্যাশা সফল করতে ব্যর্থ হয় ধ্রুব চৌধুরী। তার এ-ব্যর্থতা মূলতঃ সামন্ত-পরিবারেরই ব্যর্থতা। অবশেষে পান্নার প্রতি ধ্রুব চৌধুরীর আসক্তির সংবাদ শক্তিপদ চৌধুরীও জানতে পারেন এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জৌলুষদৃপ্ত পরিবারের অনিবার্য পতনদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। অবশেষে পরাজিত সেনাপতির মর্মজ্বালা বুকে নিয়ে আলিঙ্গন করেন মৃত্যুকে। শক্তিপদ চৌধুরীর মৃত্যু-দৃশ্যের সঙ্গে সরদার জয়েনউদ্‌দীন প্রতীকী--চিত্রকল্পে সামন্ত-তন্ত্রের ভগ্নদশার চিত্রটি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা' নিগূঢ় ও তাৎপর্যপূর্ণ :

> স্পন্দনবিহীন বড় বাবুর দেহ একখণ্ড পাষাণের মত স্থির হোয়ে আছে, সামনে ঘিয়ের বাতি জ্বালান। ডান হাতের পাশে ধূপদানী থেকে ধূপ জ্বলে জ্বলে প্রায় নিভে এসেছে।...
>
> শক্তিপদ চৌধুরীর কোন সাড়াশব্দ নাই। কি ভেবে কৈলাস বড় কত্তার গায়ে হাত দিল, মনে হোল হিম ঠাণ্ডা শরীর। কৈলাস ভয়ে আঁৎকে উঠলো। তারপর আর কোন কিছু ভাবতে পারে নাই সে, ...আতঙ্কগ্রস্ত হোয়ে চিৎকার দিয়ে পরাণকেষ্টকে জড়িয়ে ধরেছে, পরানকেষ্ট শীগগির ওঠ, বড়কত্তা যে কথা বলছে নারে।[২৩]

'ধূপদানী থেকে ধূপ জ্বলে জ্বলে প্রায় নিভে আসা'র দৃশ্যটির সঙ্গে শুধু শক্তিপদ চৌধুরীর জীবনলীলাই নয়, সামন্ত-সমাজের অবক্ষয়ের সংবাদটিও সতর্কতার সঙ্গে প্রতীকায়িত করেছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন। আত্মীয়-পরিজন-বিচ্ছিন্ন অথচ ভৃত্য-পরিবৃত শক্তিপদ চৌধুরীর মৃত্যু সামন্ত-পরিবারের দৈন্যদশাকেই প্রকারান্তরে চিহ্নিত করেছে। শক্তিপদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর ধ্রুব চৌধুরী বিষয়-বিত্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে যাত্রাদল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে গ্রাম-গঞ্জে। যার পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ত-পরিবারের পতনের গতি আরো ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন 'পান্নামোতি'তে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-প্রতিনিধিদের দ্বিধা-দুর্বলতা অঙ্কনসূত্রে দেখাতে চেয়েছেন, বিষয়নিষ্ঠার পরিবর্তে আসঙ্গলিপ্সাই

তাদের অধোগতির মূল কারণ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি ধনিক শ্রেণীর উদ্ভবের মধ্য দিয়ে সামন্তসমাজের ক্রমবিলুপ্তিসংক্রান্ত ঐতিহাসিক সত্যটি ঔপন্যাসিক 'পান্নামোতি'তে স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে 'পান্নামোতি'তে শক্তিপদ চৌধুরী ও ধ্রুব চৌধুরীর অবক্ষয় জনিত বক্তব্যটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেনি। সমাজ-বিবর্তনের যে-প্রক্রিয়ায় একটি শক্তির উত্থানে অথবা পতনের ঘণ্টা ধ্বনিত হয় তা' এ-উপন্যাসে কার্য-করভাবে উদ্ভাসিত হয়নি। সরদার জয়েনউদ্দীন সামন্ত এ-পরিবারের উদ্ভবের ইতিহাসটুকু অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেও তাদের পতনের মূলে যে বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন তা' ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। উপভোগক চারিত্রধর্ম তাদের পতনের একমাত্র কারণ হতে পারেনা—নতুন সমাজ কাঠামোর উদ্ভবই মূলতঃ এর পেছনে ক্রিয়াশীল। সমাজ-বির্তনের এ-অনিবার্য সত্যটুকু সামনে রেখে অগ্রসর হলে সরদার জয়েনউদ্দীনের এ-উপন্যাসটি সমাজ-বিকাশের অনিবার্য দলিল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারতো।

'পান্নামোতি' উপন্যাসে শুধু সামন্ত-সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রই নয়, লুপ্ত-প্রায় দাই-সম্প্রদায়ের জীবনযন্ত্রণাও প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষানুক্রমে 'আঁতুর টানা' এবং 'নাড়ী কাটা ব্যবসা'র মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে এই দাই-সম্প্রদায়। এ-উপন্যাসে বর্ণিত দাই-সম্প্রদায় শুধু তাদের জাত-ব্যবসাই নয়, সামন্ত চৌধুরী পরিবারের অনুগ্রহধন্য হয়ে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য বৃহত্তর সমাজজীবনে এরা অচল ও অস্পৃশ্য ; কারণ :

> ...দাইএরা এমন একটা জাত যাদের সাতগ্রামে দায়দায়াদী নেই। ওরা বলে ওরা মুসলমান শেখ। কিন্তু মুসলমানের সমাজে ওরা অচল। তাই কার কড়ি কে ধারে করেই ওদের জীবন বয়ে যায়।[২৪]

একদিকে জাত-ব্যবসা, অন্যদিকে সামন্তপরিবারের পুরুষ সদস্যের শয্যা-সঙ্গী হয়ে দাই-নারীরা অবলীলায় অতিবাহিত করে বছরের পর বছর। পিয়ারী দায়ানী থেকে অমৃত দায়ানী পর্যন্ত সবাই চৌধুরী পরিবারের লাল-সার ইন্ধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। চন্দনপুরের অধিবাসীরা এ-অবৈধ জীবনযাত্রা ও পাপ-প্রণয়ের সংবাদ অবগত হয়েও বাদ-প্রতিবাদের সাহস করেনি। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে; চৌধুরী পরিবারের দর্প ও দাপট ক্রমশঃ খর্ব হয়ে গেছে। অমৃত দায়ানীর গর্ভজাত বিশু আর পান্নাও অবৈধ জন্ম-ইতিহাসের ঘৃণিত ও কলঙ্কিত বাস্তবতা অনুধাবনে সমর্থ

হয়েছে, পাপ-পুন্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে; ভিন্নতর এক জগতের প্রতি হয়েছে আকৃষ্ট। এতদ্‌প্রসঙ্গে পান্নার অন্তরময় ভাবনা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ... না না, সে তার মায়ের মত চৌধুরী বাবুদের ভোগের সামগ্রী হয়ে চিরটা কাল জীবনকে উচ্ছন্ন করে দিতে পারবেনা। জীবন গেলেও না। সে বিয়ে করবে, স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার করবে। সে সংসার যত ছোট হোক, যত কষ্টের হোক, তা হবে নির্মল ও পবিত্র। ভালবাসার নিখুঁত বন্ধনে সে সংসার থেকে মুক্তো হয়ে ফুটে উঠবে সোনার কমলের মত সন্তান-সন্ততি।... নিজেকে লালসার গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।[২৫]

অন্যদিকে বিশুও জাত-ব্যবসার পরিবর্তে স্বপ্ন দেখে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনের, এবং পড়ালেখার জন্য পাঠশালায় গমন করে। অবশেষে পাঠশালা পরিত্যাগ করে দীনু শেখের পরামর্শানুযায়ী বিশু হরিচরণ কামারের দোকানে চাকরি নেয়। চৌধুরী পরিবারের অক্টোপাস থেকে মুক্ত করে পান্নাকে অন্যত্র বিয়ে দিতে কৃতসংকল্প হয় বিশু। অথচ তার সংকল্প বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধক তার মা অমৃত দায়ানী। কারণ, দাই-মেয়েদের বিবাহ-ব্যাপারে অমৃতর অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ :

> সে চিরকাল দেখে এসেছে চন্দনপুরের দাই বাড়ীর মেয়ে বউ হয়ে কোনদিন ভিন গাঁয়ে যায় না। তাছাড়া দাইবাড়ীর মেয়ে সমস্ত হলো কি না হলো এ নিয়ে দাইরা কেন কেউই কোনদিন মাথা ঘামায় না। বিয়ে একদিন এমনিই হয় বটে কিন্তু বিয়ের আগেও যেমন ছিল বিয়ের পরেও ঠিক তেমনি থাকে, ভোল কিছু বদলায়না। স্বামী একটা থাকলেও বাবুদের বাড়ীর কোন না কোন বাবু ভাল-বেসে আসা যাওয়া করেন। ... দাই বাড়ীর মেয়ের কলমা পড়ে নেওয়া স্বামীটাই আসল না ভালবাসার মানুষটাই আসল তা ঠিক বোঝা যায় না।...অমৃত চিরকাল দেখে আসছে, রাজাবাবুদের বাড়ীর লোকেরা দাইবাড়ীর কাছে হিল্লে হয়ে আসা বটগাছের মতন। তার নিজের জীবনেও অমনি হয়েছে, তার মা এমনকি তার দাদীর বেলায়ও।[২৬]

কিন্তু জন্মকলঙ্কের অভিশাপ যে কত নির্মম, ভয়ঙ্কর ও বেদনাদায়ক তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে পান্না আর বিশু। তাই মায়ের প্রত্যাশাকে

প্রত্যাখ্যান করে পান্নাকে অবশেষে সমর্পণ করা হয় আরেক দাই-প্রতিনিধি মনিরদ্দির কাছে। কিন্তু পান্নার শ্বশুর পরিবার দাই-প্রথা বিসর্জন দিয়েছে অনেক পূর্বে এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় ভিন্ন পরিবেশ-প্রতিবেশে লালিত-পালিত ও বর্ধিত পান্না নতুন পরিবেশে এসে হাঁফিয়ে ওঠে। অবশেষে স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর অব্যাহত পীড়নে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পান্না ইছামতীর বেগবতী স্রোতে জীবন বিসর্জন দেয়। পান্নার প্রতি প্রেমাসক্ত ধ্রুব চৌধুরীও নাটকীয়ভাবে অনুসরণ করে পান্নাকে।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন 'পান্নামোতি' উপন্যাসে দাই-সম্প্রদায়ের ক্রম-বিলুপ্তির পশ্চাৎ-সত্য হিসেবে দাই-প্রতিনিধি বিশু ও পান্নার কলঙ্কময় জীবনযাত্রা থেকে অব্যাহতি-প্রাপ্তির প্রত্যাশাকেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু পান্নার শ্বশুর মধুমোল্লার পরিবারে দাই-প্রথার বিলুপ্তিগত কারণ কোনটি—তা' উল্লেখ করেননি সরদার জয়েনউদ্‌দীন। শুধুমাত্র ধর্মাশক্তিই পেশা-বিলুপ্তির একমাত্র কারণ নয়। একথা সত্য যে, 'সমাজ জীবনের অন্তর্গ-ঠনের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার বহির্গঠন অর্থাৎ চৈতন্যপ্রবাহ। বস্তুত, সমাজজীবনের বিবর্তনশীলতা স্বায়ত্তশাসিত বা স্বয়ংক্রিয় নয়, বরং তা নির্ভরশীল উৎপাদনযন্ত্র বা উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশের ওপর।[২৭] যেহেতু এ-উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক-পরবর্তী সময়প্রবাহ চিত্রিত হয়েছে, সেহেতু আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি, বিশেষ করে মাতৃসদনের বিস্তার দাই-প্রথার ক্রমাবিলুপ্তির পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিলো বলে মনে হয়। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের ঔপন্যাসিক-দৃষ্টি সেদিকে ধাবিত না হওয়ায় একটি সম্প্রদায়ের ক্রমবিলুপ্তিগত সংবাদ-প্রসঙ্গটি হয়ে গেছে একপেশে এবং খণ্ডিত। অবশ্য পান্না এবং বিশুর আন্তর্জ্বালার বিশুদ্ধচিত্রায়ণে উপন্যাসটি একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি হিসেবে বাংলা উপন্যাসপ্রবাহে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র।

চার

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'অনেক সূর্যের আশা' (১৯৬৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-আক্রান্ত জনজীবনের বিশ্বস্ত রূপায়ণে সমৃদ্ধ একটি উপন্যাস। এ-উপন্যাসে যুদ্ধকালীন ভয়াবহতার সঙ্গে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে উন্মুখর

ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থার দ্বিধাজটিল মানসিকতা চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটি ইতিহাস-আশ্রয়ী। ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের উত্তাল টানে বিপর্যস্ত সমাজজীবনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। উপন্যাস-বিধৃত ঘটনাপুঞ্জের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিতির ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে লেখকের অন্তর্গত অভিজ্ঞতার সারসত্যবাহী। এতদ্‌প্রসঙ্গে লেখকের উচ্চারণ নিম্নরূপ :

> ১৯৩৯ সালে ইউরোপীয় স্বার্থের দ্বন্দ্বে সৃষ্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—যার লেলিহান শিখায় পাক-ভারত তথা এশিয়ার অসংখ্য প্রাণ খড়কুটোর মত পুড়েছিল, এবং এক নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট মানবাত্মাকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এর ফলশ্রুতি—এক মুঠো আহার না পেয়ে মানুষ নিজের ইজ্জত খোলাম-কুচির মতো বিকিয়েছিল, পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল তার নৈতিক ধর্ম।
>
> সে-সব দিনের অনেক ঘটনা চাক্ষুস দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে ; সেগুলো আঘাত করেছে আমার মানসপটে, হৃদয়ে। এ-উপন্যাস সে-সব মনোবেদনারই জীবন্ত চেতনা বা ভাষারূপ।[২৮]

পরবর্তীকালে রচিত 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' (১৯৭৫) উপন্যাসের এক পর্যায়ে 'অনেক সূর্যের আশা'-সংক্রান্ত লেখকের স্মৃতিমুগ্ধ উচ্চারণ এতদ্‌প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ...আজকাল বড্ড লেখার নেশায় পেয়েছে। রাতদিন তাই লিখি। লিখি উপন্যাস। ''অনেক সূর্যের আশা' নাম রেখেছি তার, এ আমার অতীত জীবনের ক্ষয়ক্ষতি, সুখ দুঃখ, প্রীতিভালোবাসা, জীবন মরণের স্মৃতি।[২৯]

এদিক থেকে বলা যায় উপন্যাসটি স্মৃতিচারণমূলক। স্মৃতিময় অনুষঙ্গে লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকাল থেকে ভারত-বিভাগ পর্যন্ত সময়প্রবাহকে এ-উপন্যাসে ধারণ করেছেন। 'উপন্যাসটি উত্তমপুরুষে লেখা। বিস্তৃত ক্যানভাসে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মানুষের নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সংকট, মানুষের জীবনযুদ্ধের বহুভুজ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।'[৩০]

'অনেক সূর্যের আশা' একটি চরিত্রবহুল উপন্যাস। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র রহমত। রহমতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-উপন্যাসে ব্যাপকভাবে যুগজীবন ও

যুগচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান-অপ্রধান চরিত্রগুলোও সজীব ও প্রাণবন্ত। হায়াত খাঁ, হেনার মা, ছমির মিয়া, লুসি সাইপ্রিন, সাজাহান চৌধুরী, কমলকুমার রায়, মিস রডারিক, কাজী গিয়াসুদ্দিন, আবদুল হামিদ, কবি নিজাম, ভীমরুল, জামরুল, পাণ্ডেজী, ফজলুল করিম, মিঃ গাঙ্গুলী, সুলতান মিয়া—এরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ভূমিকায় উজ্জ্বল। এদের যন্ত্রণা-দগ্ধ জীবনযাপন অঙ্কনসূত্রে লেখক সামসময়িক সমাজজীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে পরিবেশন করেছেন।

উপন্যাসের সূচনায় লেখক নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে সামাজিক মানুষের জীবন ও জীবিকার দুর্বিষহ অবস্থা তুলে ধরেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের মোহময় শ্লোগানে আকৃষ্ট হয়ে এ-দেশের সাধারণ মানুষ যে-পাকিস্তানের গোড়াপত্তন করেছিলো, সে-পাকিস্তানে তাদের বঞ্চনাময় জীবনযাপনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক টঙ্গীর সোনার গাঁ মিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হায়াত খাঁর প্রসঙ্গটি সুকৌশলে উপস্থাপন করেছেন। অথচ পাকিস্তান-অর্জনের আন্দোলনে এ-হায়াত খাঁ ছিলেন অগ্রণী। একটি সুখী, সুন্দর, শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কলিকাতার বেকারজীবনে লেখক হায়াত খাঁর সঙ্গে একবালপুর লেনের একটি মেসে বসবাস করতেন। সে-মেসে আরো থাকতেন সাফাজ, মফিজ আর ছমির মিয়া। এদের মধ্যে সাফাজ এ. জি. বি.-র পিয়ন, হায়াত খাঁ জাহাজ ঘাটের শ্রমিক, মফিজ ও রহমত বেকার, ছমির মিয়া জীবনদৃষ্টিতে স্থূল ও বেকার। লেখকের বর্ণনানুযায়ী সে-মেসের জীবনপ্রবাহ ছিলো এরকম:

> মেস আমাদের ছিল, কিন্তু পাকশাক হতোনা। ঐ থাকাটা পর্যন্তই। হেনার মা ঝি দু'বেলা খাওয়াতো—চারপয়সার ভাত, এক পয়সার ভাজি, আর দু'তিন চামচ ডাল যার কোন পয়সা লাগতো না। মানে পাঁচ পয়সায় খাওয়া হয়ে যেতো। তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু মাছের ঝোল হলে আরও দু'পয়সা। শীতের দিনে কখনও কখনও সকালে পিঠে নিয়ে আসতো—ভাপা পিঠে। খেজুরের গুড় ভেতরে ভরা। বড়খানা দু'পয়সা আর ছোটখানা এক পয়সা।[৩১]

এভাবেই দিন যায়। প্রায়ই সাফাজ আর হায়াত খাঁর উপার্জনের ওপর নির্ভর করে কেটে যায় মফিজ আর রহমতের দিন। দুজনেই শিক্ষিত, অথচ

বেকার। তবু অবরুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত সমাজব্যবস্থায় এরা যাপন করে উপ-দ্রুতের জীবন। রহমতের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> সাফাজ আর মফিজ কথা শুনতে শুনতে এরিমধ্যে শুয়ে পড়েছে। আমি গিয়ে ওদের পাশে শুলাম। সাফাজ কেবল বললো, এক বিছানায় তিনজন শোওয়া বেজায় মুশকিল, যা ভ্যাপসা গরম, একটু গুঞ্জিস হয়ে শোও। আমি আধ পিঠ বিছানায় আর আধপিঠ শানের উপর ছড়িয়ে দিয়ে তবে শুলাম। ...মফিজের কেন ঘুম আসছেনা তা' বুঝতে পেরেছি। চাকরী আমারও নাই ওরও নাই। সেও পরের খায়, আমিও তাই। কিন্তু ও সারাদিন হন্যে হয়ে চাকরী খোঁজে। ডকে, কারখানায়, সরকারী অফিসে, কোথাও বাদ রাখেনা। কিন্তু চাকরি কোথাও খালি নাই, এমনকি কর্পোরেশনের মেথরেরও না।[৩২]

মফিজের চাকরি হয়না। বয়সক্লান্ত পিতা ও মাতা অবিরাম মফিজের প্রতীক্ষায় থাকেন ; স্বপ্ন দেখেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের। অথচ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে তাদের দুর্ভোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম হয় আকাশচুম্বী। এরকম দুঃসহ পরিস্থিতিতে বিশ্ব-বিবেককে স্তম্ভিত করে দিয়ে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা। এ-যুদ্ধে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জনপদ মুখোমুখি হলো নির্মম সত্যের। একবালপুর লেনের অখ্যাত মেসটিও এ-নির্মমতা থেকে নিষ্কৃতি পেলোনা—'সারা কলকাতায় হৈ চৈ পড়ে গেল, বোমা পড়লে যেমন হৈ-চৈ পড়ে তেমন।... জার্মানী অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেছে। সারা বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধ বাধবো বাধবো করছিল, তা বেধে গেলো। কয়েকদিনের মধ্যেই আরো কয়েকটি রাজশক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো, যার মধ্যে আমাদের মহান সম্রাট ব্রিটিশ রাজও রয়েছেন। ...অতএব—সাত সমুদ্দুর এপারের ভারতবর্ষে জিনিস-পত্রের দাম হু হু করে বাড়তে লাগলো, ফলে হেনার মা ঝিয়ের চার পয়সার ভাত ছ'পয়সায় চলে গেল, এক পয়সার ভাজি দু'পয়সা আর সবচেয়ে আশ্চর্য। বিনা পয়সার ডালের দাম এক ঝোঁকেই দু'পয়সা। ...কেননা চা'ল দ্বিগুণ দামেও বাজারে পাওয়া যাচ্ছেনা, ডালও তাই। সাফাজ আর হায়াত খাঁ নানা অনেক মোচড়ামুচড়ি করে শেষে মেনে নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু আমি আর মফিজ যেন আরও মনমরা হয়ে গেলাম।'[৩৩]

এ-যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের জনজীবনে ধস নামে ; অভাব অনটনে আক্রান্ত হয় সমস্ত দেশ। এ-সময় পণ্য-বিপণীগুলোতে দেখা যায় প্রচণ্ড ভিড় ; সেখানে অর্থ-ব্যয় করেও পণ্য-প্রাপ্তি দুষ্কর—"সারা কলকাতার বাজারে এক ছটাক চাল কিনবার উপায় নেই। টাকায় সোনা মেলে কিন্তু চাল মেলেনা তাই রেশানের দোকানের দরজা খুলবার অনেক আগে থেকেই, ছা-পোনা হতে শুরু করে মেয়েমানুষ বেটাছেলে সব এলোপাথাড়ি মিলে আজব এক রকম জগা-খিচুড়ী হৈ হৈ কেঁই কেঁই শুরু হয়।

এ ভিড় এড়ায় কার বাপের সাধ্য। চাল নামক বস্তু পেলেই হয়, তাতে কাঁকরই থাক আর পাহাড়-পর্বতই মেশানো থাক তাতে কিছু আসে যায় না। এমনকি ভিড়ের চোটে নিরুপায় হয়ে অনেক সময় দোকানী দোকান বন্ধ করে দিত। তা নিয়ে সময় সময় খবরের কাগজে হৈ চৈও হয়েছে, শেষে পুলিশের বন্দোবস্ত।"[৩৪]

কিন্তু প্রশাসনের সমস্ত স্তর যেখানে দুর্নীতি-কবলিত সেখানে পুলিশ বাহিনীও সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত নয়। উৎকোচের বিনিময়ে তারা সেবার হস্ত প্রসারিত করে ; সাধারণ মানুষকে নিক্ষেপ করে চরম অনিশ্চয়তায়। অবশ্য এ-সময় নব-উদ্ভাবিত 'কিউ লাইন' মানুষকে সাময়িকভাবে হলেও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। একটি উদ্ধৃতি : 'পুলিশ দিয়ে কবে কি হয়েছে, এক ঘুষ খাওয়া ছাড়া। ওটাই ওরা খুব ভালভাবে পারে। ...সেজন্যই দেখা যায়, যার নিকট থেকে চারটা পয়সা কি একটা সিগারেট বিড়ি পেয়েছে তাকেই ভিড় ঠেলে সামনে নিয়ে এগিয়ে দিয়েছে, এরূপ অনেক ধ্বস্তা-ধ্বস্তি অনেক লাঠালাঠি অনেক গাল-মন্দ উপোষ-নিপোষের পরে কে বা কারা কলকাতায় নিয়ে এলো আজব এক চিজ—'কিউ লাইন'।... কলকাতার মানুষের রপ্তে এসে গেল, কিউ দাও—লাইন কর, রেশন নাও।'[৩৫] শুধু কলিকাতা নয়, সারা বাংলাদেশ এ-সময় এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন। সারা ভারতবর্ষে যখন বেকারের সংখ্যা ক্রম-স্ফীত, ঠিক তখনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতো আপাত-সুখের অন্বেষায় এ-যুদ্ধকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসংখ্য তরুণ। উদ্যত খড়্গের মতো যে-বেকারত্ব তাদের মাথার ওপর ঝুলছিলো, তা' থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই ছিলো এ-যোগদানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। 'অনেক সূর্যের আশা'র রহমত আর মফিজও যোগদান করলো এ-মানবতাবিধ্বংসী যুদ্ধ-আয়োজনে।

অবশ্য সমাজজীবনে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও থাকেন নিরাপোষ এবং প্রতিবাদী। ডক-শ্রমিক হায়াত খাঁ এ-প্রতিবাদী সম্প্রদায়েরই একজন ; যিনি মানবতাবাদী বোধে ও বিশ্বাসে উজ্জীবিত। তাঁর মতে, যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির স্বার্থসংরক্ষণের হাতিয়ার। তুচ্ছ লাভ-লোকসানের ভাগ-বাটোয়ারার দ্বন্দ্বে পররাজ্যলিপ্সু শক্তিবর্গ অসহায় মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় যুদ্ধ-উন্মাদনা। একজন সাধারণ শ্রমিক হয়েও হায়াত খাঁ এ-সত্য অনুধাবনে সমর্থ হন, এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছু পরিণাম-বিবর্জিত যুব-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে তিনি সখেদে উচ্চারণ করেন :

> শালার নির্বোধ ভারতবাসী! নিজের ভাল নাকি পাগলেও বোঝে, কিন্তু এই ছাগল জাতটা আজতক নিজের ভালও বুঝতে পারলো না। দু'শ বছর ধরে ব্রিটিশের গোলামী করতে করতে একেবারে গোলামের জাত বনে গেছে। না হলে কোথায় লড়াই সেই ইউরোপে, সাদা চামে সাদা চামে কাটাকাটি তাতে তোদের কিরে বেটার। যে অমন করে সিপাই সাজবার জন্য হাঁকড়াচ্ছিস। চিরকাল ভরে এইতো করলি, ব্রিটিশের সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য সামরিক গোলাবারুদ বা যুদ্ধের আগুনের খড়কুটো হয়েই জ্বললি।[৩৬]

একবালপুর লেনের সে-মেসের অপর সদস্য ছমির মিয়া। আকারে-প্রকারে, আচরণে-উচ্চারণে একান্তভাবে স্থূল এ-মানুষটির গতিবিধি দেখলে মনে হয় সংসারের সর্বত্রই সে অস্তিত্বমান। যে কোনো ঝুট-ঝামেলায় তার অবস্থান প্রথম সারিতে। "দেশের বাড়ীতে দুই-দুইটা বউ, তিন-চারটি ছেলেমেয়ে" রেখে সে মেস-পরিচারিকা হেনার মাকে প্রেম-নিবেদন করে : জৈবিক লালসা চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়। অবশেষে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হেনার মা ছমির মিয়ার এই অপ-উদ্দেশ্যের কথা অকপটে প্রকাশ করবার পরও তার মধ্যে কোনো প্রকার ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না ; বরং সে প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয় এবং নিলাজ, খ্যাপাটে ও বিবেকবর্জিত মানুষের মতো উচ্চারণ করে : "ওই বেশ্যা মাগীটার যদি সত্যিই তোমরা কিছু উপকার করতে চাও তা'হলে ওর মেয়েটাকে সাবধানে রাখতে বলো। আল্লার কসম, আমি ওকে ভাগিয়ে নিয়ে ঠিক সোনাগাছি বিক্রি করে দেবো।"[৩৭]

সাফাজ হচ্ছে মেস-জীবনের একজন নির্বিকার সদস্য। পেশায় এ জি বি-র পিয়ন হলেও সে একজন চিত্রশিল্পী। ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে সে

ছবির অর্ডার পায়, ছবি সরবরাহ করে, অথচ পরিশ্রম অনুযায়ী সে অর্থ পায় না। তবু কারো বিরুদ্ধে তার জোরালো অভিযোগ নেই, প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ানোর সাহস নেই।

সরদার জয়েনউদ্দীন 'অনেক সূর্যের আশা'র সূচনা-সূত্রে একবালপুর লেনের এ-মেসটিকে উপস্থাপন করবার পশ্চাতে কোনো গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে কিনা তা' আমাদের অজ্ঞাত। তবে এ-মেস-জীবন যে বৃহৎ সমাজ-সংসারের একটি ক্ষুদ্ররূপ তা' নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায়। এখানে আমরা লক্ষ্য করি বিচিত্র চরিত্রসম্পন্ন মানুষের সহাবস্থান ; যারা কোনো-না-কোনোভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। এখানে আছে রহমত ও মফিজ, যারা যোগ্য হয়েও বঞ্চিত ; আছে হায়াত খাঁর মতো আপোষ-হীন মানবতাকামী, ছমির মিয়ার মতো শঠ-প্রবঞ্চক এবং সাফাজের মতো সরল-নির্দ্বন্দ্ব চরিত্র। 'অনেক সূর্যের আশা'র বিশাল ক্যানভাসে যে-সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে এ-সমস্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সরদার জয়েনউদ্দীন তাই হয়তো ঔপন্যাসিক-বিষয়ের মূল গর্ভাংশে প্রবেশের পূর্বে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে মেস-জীবনের এ-বিচিত্র জীবনযাপনপ্রণালী পরিবেশন করেছেন।

একবালপুর লেনের সে-ই মেস থেকে শুধুমাত্র বেকারত্ব মোচনের তাগিদে রহমত আর মফিজ সবার অলক্ষ্যে বহির্গত হলেও সমরকর্তাদের ইচ্ছানুযায়ী কিয়ৎকাল পরেই তাদের দু'জনকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। রহমতকে যেতে হয় লাক্ষ্মৌয়, আর মফিজকে কিরকীতে। লাক্ষ্মৌয় গিয়ে রহমত সান্নিধ্য পায় যতীন দাস, সাজাহান চৌধুরী, কমলকুমার রায়, মহেশ ভটচার্জি প্রমুখ দুরন্ত অথচ কচি-কোমল, নিষ্পাপ বাঙালি তরুণের। হাসি আর আনন্দের মধ্য দিয়ে দিন কয়েক অতিবাহিত হওয়ার পর এলো বদলির আদেশ : রহমত ল্যান্সডাউনে, কমল কলিকাতায়, ভটচাজ ইমফলে, সাজা বার্মা বর্ডারের টেকনাফে।

ল্যান্সডাউন এসে এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহমত এক নবতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। নারী এবং পুরুষের অবাধ মিলনে সে প্রত্যক্ষ করে মূল্যবোধের বিপর্যয়। 'উওম্যানস অক্সিলিয়ারী কোর-এর নারীবাহিনীর 'আধাপুরুষ' মেয়েদের অবাধ চালচলনে রহমত আবিষ্কার করে সামাজিক বপর্যয়ের ইঙ্গিত :

এরা অফিসের কাজ যত না করে প্রেম করে বেড়ায় তার চেয়ে অনেক বেশী। সত্যি প্রেম করে কিনা তাও জানিনা, তবে কিনা যখনই যেখানে যাও নির্জন পাহাড় কিংবা ঝর্ণার ধারে দেখবে কেউ না কেউ জোড়া ধরে হয় বগলতলায় হাত ঢুকিয়ে চলে চলে গল্প করে, নয়তো পাহাড়ের টিলায় মুখোমুখি বসে বসে। ওরূপে ওদের দেখলেই আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন ছিঃ ছিঃ লাগে। ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে যায়। এ যুদ্ধ বুঝি ভারতবর্ষের জমিনটা অপবিত্র করে দিল!

শুধু এই-ই নয়। মাঝে মাঝে হাসপাতালের ডিউটীরুমে, অফিসে সাহেবদের খাস কামরায় ঘটতো যা তা কাণ্ড। বেয়ারারা মুখ টেপাটিপি করে হাসতো, আর বলতো, ওদের লড়াইতে আনাই হয়েছে এই কাজে অর্থাৎ সেপাই মানুষদের-লড়ুয়েদের চিত্ত-বিনোদন করবার জন্যে।

এসব কথা শুনে মনটা আমার আবার ছিঃ ছিঃ তে ভরে যেত।[৩৮]

ল্যান্সডাউন-এ এসে নারী-পুরুষের মিলন-মেলায় রহমতের মনে যে-আশঙ্কা উপ্ত হয়, কলিকাতার জীবনযাত্রায় পা রেখেই সে বুঝতে পারে যে-আশঙ্কা অমূলক নয়। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে কলিকাতা আমূল বদলে গেছে। ভদ্রতার নির্মোকে কলিকাতা পৌঁছে গেছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে: "বাপরে—ভিড় কলকাতা! পথঘাট এক জনারণ্য। মিলিটারী ট্রাক, গাড়ী আর গাড়ী, গাড়ীরই যেন বন-বাদাড়। পথ চলে কার বাপের সাধ্য। চল্লিশে রেখে এসেছি বাঙালীদের কলকাতা, খুব বেশী তো ভারতীয়দের, এখন এই বিয়াল্লিশে ফিরে দেখি, দু'বছর পরের কলকাতা যেন খাকী উর্দীপরা নানা রঙের সাহেব সুবা ওয়াকী রমণী ও আরও কত বিদেশী বিদেশিনীদের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। এ কলকাতাকে আমাদের সেই কলকাতা বলে আর আপন করে যেন চিনতে পারি না, নিজের মাটি বলে পায়ের কাঁপন থামিয়ে এখানে যেন দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারিনা।"[৩৯]

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনজীবনে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়েছিলো তার বিষময় ফল ইতোমধ্যে ফলতে শুরু করেছে। সাজার আচরণ-উচ্চারণে পরিবর্তন এসেছে, বিয়ে করেছে; মদ এবং নারীর মধ্যে সে

এখন জীবনের অর্থ খোঁজে। কিন্তু কমল? সাজার কথায়: "হি ইজ এ বাস্টার। তার সিফিলিস হয়েছে, শ্রীরামপুর ডি. ডি. হসপিটালে সে এখন দিনে চার পাঁচবার গা ফুঁড়িয়ে ওষুধ ঢুকাচ্ছে, আর বিশেষ জায়গায় মলম ঘষছে।"[৪০]

কিন্তু কমলতো সমাজ-পরিবেশবিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয়। কলিকাতার প্রত্যেকটি ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবকইতো এক-একজন কমল। সাজার অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করা যাক:

> কলকাতায় বাস করে সিফিলিসের হাত এড়িয়ে চলা এত সহজ কথা নয় এখন! এক মুনি ঋষি ছাড়া তা কেউ পারবেনা। সে এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম-পোড়ান আগুনের মত। প্রত্যেকটি অলি গলিতে সিফিলিসের জার্ম বোঝাই মেয়েরা দু'হাত বেড় দিয়ে মানুষকে ধরছে আর দেহে সে বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।[৪১]

অথচ উপায় নেই। মুহূর্তের অনবধানতায় যে হলাহল তারা আকণ্ঠ পান করে চলেছে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা তাদের অজানা নয়। গ্রীক ট্রাজেডির নায়কের মতো এ-সমস্ত তরুণ-তরুণী ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ধাবিত হয় মর্মান্তিক বিপর্যয়ের দিকে। নিয়তি যত নির্দয়ই হোকনা কেন, তাকে এড়ানোর সাধ্য তাদের নেই। তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তারা পারতপক্ষে তাকায়না; বর্তমানকে উপভোগ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সিস্টার ডিসিলভার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়: "কেউ কাউকে ভালবাসেনা, আসলে ভালবাসা কথাটাই এখানে আসেনা; এ কেবল এক জৈবিক ক্ষুধার তাড়না। আজ ছয় সাত মাস হ'ল মিলিটারীতে নার্স হয়ে এসেছি, এসে অবধি একই অবস্থা, পিনপিনে মিনমিনে প্রেমের কথা কানের পাশে শুনে আসছি—আমার জন্যে কারো প্রাণ যায়, কেউ না পেলে আত্মহত্যা করতে চায়, আসলে সব মিথ্যা, সব কেবল ভোগ-লালসার জন্যে কারসাজী। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, গোয়ায় ফিরে যাই। কিন্তু দেশে ফিরে গিয়েও তো উপায় নেই। সেই দারিদ্র্যের সঙ্গ—সস্তাদামের বীফ না হয় মাটন্ আর কুচো চিংড়ী লবস্টার, এ নিয়েই চারদিক অভাবে জোড়াতালি দিয়ে চলা, দুর্ভিক্ষকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোর প্রচেষ্টা।"[৪২] তবু সিস্টার ডিসিলভা শেষ-অবধি নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। অধিক সুখের আকর্ষণে সেও প্রলুব্ধ হয়েছিলো, পাপ-পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়েছিলো জীবন-তরী। অবশেষে হৃদয়বিদারক মৃত্যুর

মধ্য দিয়ে সে প্রমাণ করলো, একটি পচনশীল সমাজে ভোগের পসরা সাজিয়ে প্রতারক প্রেমিকদের লালসার ইন্ধন জোগানো যায়, কাউকে হৃদয়ের সঙ্গে একান্তভাবে লগ্ন করা যায় না।

বিত্ত আর প্রাচুর্যের সমারোহ সত্ত্বেও সাজা আর সাইপ্রিণ কেউই পরস্পরকে ধরে রাখতে পারেনি। যুগ-যন্ত্রণার নির্মম ক্রুশে তারা রক্তাক্ত হয়েছে, তবু একে অপরের হৃদয়রহস্যের কিনারা খুঁজে পায়নি। সাইপ্রিণ তাই অবশেষে ঘর ছেড়েছে, আর সাজা সমাজ-সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বরণ করে নিয়েছে মৃত্যুকে।

যুদ্ধের নির্মমতায় সামাজিক মূল্যবোধের পতনদশা যখন প্রায়-স্পষ্ট, ঠিক তখনই কলিকাতার জনজীবনে আবির্ভূত হয় সুবিধাভোগী লুটেরা শ্রেণী। গণমানুষের অসহায়ত্বের সুযোগে এরা অবলীলায় বিবেককে বিসর্জন দিয়ে স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠে। প্রাচুর্যকে স্ফীত করবার প্রয়োজনে এ-সময় এরা ঘৃণ্য, পরিত্যক্ত, জঘন্য ও অমানবিক পথ অনুসরণে দ্বিধা করেনি। রহমতের কাছে প্রেরিত সাফাজের পত্রে ছমির মিয়ার সংবাদপ্রদানসূত্রে এ-সব সুবিধাবাদী চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন লেখক :

> ...একদিন কার্জন পার্কে ছমির মিয়ার সাথে দেখা, সঙ্গে একটা মেয়ে মানুষ। সাজ-পোশাকে দু'জনারই বেশ বড়লোকী ভাব! খুব হাসি-খুশীভাবে আলাপ করলো। একটা উডবাইন সিগারেট খাওয়ালো। বললো, খাও, মিলিটারী সাপ্লাই, আমাদের হাতে আসে কায়দায়। আজকাল নাকি কাঁচা পয়সাও খুব আমদানী হচ্ছে। যাতে হাত দেয় তাতেই পয়সা। মন্ত্রীদের সাথে আলাপ পরিচয় পর্যন্ত করে ফেলেছে। তাদেরি কল্যাণে ছোটখাটো ঠিকেদারী, পারমিট এসব পাচ্ছে। পয়সা তো ওতেই।
>
> গুড়ে মাটি চলছে প্রায় ফিফ্‌টি, ফিফ্‌টি, চালে কাঁকরও তার নেহাত কম নয়, অতএব মহাজন কণ্ট্রাক্টর ফেঁপে উঠছে রাতারাতি। ছমির মিয়ার চেহারায়ও তাই আজকাল জৌলুশ ছাড়ছে, খোলতাই হচ্ছে।[৪৩]

হামিদের পত্রে জানা যায় :

> আজকাল ব্লাক মার্কেট বলে একটা মার্কেট চালু হয়েছে বাঙলাদেশে। সে মার্কেটটা যে ঠিক কোথায় তা জানা যায় না, তবে প্রায় সবার

মুখে ঐ ব্লাক মার্কেট কথাটা আজকাল হরদম উঠানামা করছে। সবাই বলছে, ক'দিনের মধ্যে দেশে ব্লাকমার্কেট ছাড়া আর মার্কেট থাকবে না।... কোন জিনিসই তুমি ঠিক দামে পাবেনা, দোকানে যাও, সেখানেও ব্লাক মার্কেট চালু, অবশ্য দামটা সেখানে ঠিক রেখেও অভিনব পন্থায় ব্লাক মার্কেট চালু করা হয়েছে, অর্থাৎ চালের অর্ধেক কাঁকড় আর ধুলোবালি। শুনে আশ্চর্য হবে, পার্ক সার্কাসের আমাদের সেই ঢাকার নাসিম মিয়া নাকি বোম্বে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে হাজি হয়ে মহাসাধু সেজে ফিরেছেন।... লোকেরা কিন্তু অন্য কথা বলে যে, নাসিম মিয়ার হাজি খেতাবটাও কালোবাজারী মানে ব্লাক মার্কেটে কেনা—আসল নয়। আর ব্যবসার কথা, সে বাদ দাও, ও ব্লাকই সব—আসল বলে কিছু নাই।[৪৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু শহর-জীবনই নয়, আবহমান বাংলার শুদ্ধ-শান্ত গ্রামীণ জীবনও পেঁাছে গিয়েছিলো বিনষ্টি আর দেউলিয়াত্বের চরম সীমায়। অভাব-অনটন-খাদ্যাভাবে সহজ-সরল গ্রামীণ মানুষ বাধ্য হয়েছিলো মানবেতর জীবনযাপনে। জীবিকার অন্বেষায় তারা দলে দলে ভিড় করেছিলো শহরে, বিকিয়ে দিয়েছিলো মান-সম্ভ্রম-ইজ্জত। 'অনেক সূর্যের আশা'য় হামিদের কাছে লিখিত কালা চাচার পত্রে গ্রাম-জীবনের যে-চিত্র পাওয়া যায় তা' নিম্নরূপ :

গ্রামের লোকজন কচু-ঘেঁচু শেষ করেছে—এখন মাটির শানকি ঝুলিয়ে নিয়ে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে এক এক করে অন্নের অন্বেষণে শহরে মেলা করছে।

তোমার ধলা চাচা এই সেদিন উদরাময়ে এন্তেকাল করেছেন। তাঁর বোবা মেয়েটি ক'দিন শোকে আর ক্ষুধায় পথে পথে বোঁ বোঁ করে বেড়ালো, তারপর কার সাথে কোথায় যেন চলে গেছে। তোমার ধলা চাচী পিরুর মা সে অনেকদিন পূর্বে দেশ ছেড়ে কোথায় যে গেল, আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না।

ও-পাড়ার কোকন সা কি যেন খেয়ে পাগল হয়েছে, বৌ সৌদামিনী গলায় রশি দিয়ে ঘরের আড়ার সাথে ঝুলে মরেছে। দেশে আজ-কাল অনেক পাগল বেড়েছে। কি সব যা পায় তাই খায়, সে জন্যেই বুঝি এমন হয়েছে।[৪৫]

সুদূর সন্দীপ থেকে হাফিজনের মা তার স্বামী সুলতান মিয়াকে গ্রাম-জীবনের দুঃসহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে যা' লেখেন তা' যেমন ভয়াবহ, তেমনি মর্মান্তিক। "সুলতান মিয়ার ছোট বিবি ক্ষুধার জ্বালায় তেষ্ঠাতে না পেরে গাঁয়ের হিরু মাতবরের সঙ্গে চাটগাঁ শহরের পথে চলে গেছে। সেখানে গেলে খাবার পাবে। হিরু মাতবর মিলিটারীতে কুলী কামীন সাপ্লাই দেয়, তাতে পয়সা পায় অনেক। মেয়ে মানুষ কামীনের দাম নাকি অনেক বেশী, বয়স কম হ'লে তো কথাই নেই—লুফে বিক্রী হয়। হারামী আমার মেয়ে হাফিজনকে পর্যন্ত নিয়ে যাবার কথা বলেছিলো। আস্পর্দা কত!"[৪৬] অবশেষে অভাববোধের কাছে বিবেকবোধ পরাভব মানে ; হাফিজনের মাও হাফিজনকে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়। পেছনে পড়ে থাকে তিল-তিল করে গড়ে তোলা সংসার। সর্বনাশা যুদ্ধের ফলে এভাবে গ্রাম বাংলার নারী-লক্ষ্মীরা শাহরিক-সুখের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে অতঃপর অলিগলিতে, অন্ধকারে দুর্জনের অঙ্কশায়িনী হয় ; আক্রান্ত হয় যৌন ব্যাধিতে। ভিনীরিয়্যাল ডিজিজ হাসপাতালগুলোতেও স্থান সংকুলান হয় না।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন 'অনেক সূর্যের আশা'য় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিধ্বস্ত সময়প্রবাহ অঙ্কনে সামাজিক অধোগতির চিত্র যতটুকু গুরুত্ব সহযোগে অঙ্কন করেছেন, সামসময়িক রাজনীতির গতিপ্রবাহ অঙ্কনে ততটুকু আন্তরিক ছিলেন না। মহাকাব্যধর্মী এ-উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে তৎকালীন রাজনৈতিক দলসমূহের বহুমুখী কার্যক্রম অর্থবহ সমগ্রতা নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। অবশ্য যুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিক্রিয়া এতে আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ইংল্যাণ্ড ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে সর্বভারতীয় কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠন তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ-অন্যায় যুদ্ধে ভারতের জনবল ও অর্থসম্পদ ব্যবহার না করার জন্য এ-রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করে দেয় এবং জনমতগঠনে প্রয়াস পায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার 'ভারত রক্ষা আইন' জারী করে যুদ্ধবিরোধী সমস্ত প্রচার-প্রচারণা ছাড়াও রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন জার্মান বাহিনী কর্তৃক পৃথিবীর প্রথম

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মত পরিবর্তন করে। অন্যদিকে কংগ্রেস তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও সুভাষ বোসের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে, এবং জার্মান-জাপান-ইতালির ফ্যাসিস্ট শক্তিকে সমর্থন দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। 'অনেক সূর্যের আশা'য় সর্বভারতীয় কংগ্রেস এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের এ-সময়কার তৎপরতার প্রাসঙ্গিক কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপন্যাসের একটি এলাকায় সাজার দৃষ্টিকোণ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সফলতা অথবা ব্যর্থতার সংবাদ বর্ণিত হয়েছে এভাবে: ''যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ কোহিমা প্রায় ধর ধর করছে, তখনো আমরা বৃটিশের হয়ে হাজার হাজার ফৌজ বন্দুক কামান কাঁধে ওদিক পানে দৌড়াচ্ছি আর বলছি, দাঁড়া—লড়াই শেখাই। রাত্রে শুনো, রেডিওতে আওয়াজ আসে 'আমি সুভাষ বলছি, আপনারা লড়াই-এর পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখুন। পরাজয়ের প্লাবন শুরু হয়েছে, বার্মার পতন হয়েছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।''[৪৭] রেডিও-বার্মার স্পেশাল নিউজ বুলেটিন সংযুক্তির মাধ্যমে এ-উপন্যাসে যুদ্ধ এবং রাজনীতির সংবাদ অত্যন্ত চমৎকার ভাবে পরিবেশন করেছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন :

> ...বার্মার সীমান্তে এখনো ব্যাপক যুদ্ধ চলছে, যদিও বিশেষ সুবিধার জন্যে আমাদের সৈন্য বাহিনীকে তৎপরতার সঙ্গে বার্মা ছেড়ে কৌশলে আসাম সীমান্তের নতুন ঘাঁটিতে পিছিয়ে আসবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ এবং এ্যামেরিকান নিগ্রো বাহিনী পূর্বেই নিরাপদ সীমান্তে এসে পৌঁছে গেছে যদিও প্রোম, পেগু, টাঙ্গু প্রভৃতি এলাকায় ভারতীয় বাহিনীকে ঘিরে জাপানী ফৌজের সাঁড়াসী আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে তবুও ভারতীয় বাহিনী এখন পর্যন্তও সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে পিছু হটছে।
>
> আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ধ্বংসমূলক কার্যে লিপ্ত থাকার জন্যে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসকে বেআইনী প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করা হয়েছে, মহাত্মা গান্ধী ও জহরলাল নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস-নেতাদের রাজনৈতিক কারণে আটক করা হয়েছে।[৪৮]

উপন্যাসের একটি এলাকায় ব্রিটিশ এবং ভারতীয় বাহিনীর প্রতি ভারতীয় জনগণের মনোভাব এবং মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ সাজার প্রেক্ষণবিন্দু থেকে

সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে : "এ অবস্থায় বাইরে যাওয়া ঠিকনয়, মিলিটারী পোশাকে তো নয়ই। কেননা ওরা মিলিটারীর উপরেও ক্ষেপা। কারণ মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ আছে— এ যুদ্ধে ভারতবর্ষকে অন্যায় করে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে সুতরাং ভারতবাসী এ যুদ্ধে কিছুতেই বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করবেনা। তাই যারা মিলিটারীতে যোগ দিয়েছেন তাদের প্রতি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা মোটেই খুশী নয়।"[৪৯]

উপন্যাসের কোথাও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মতৎপরতার উল্লেখ করা হয়নি। ডক-শ্রমিক হায়াত খাঁ যখন বলেন "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক", অথবা যখন তিনি মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক-সম্বন্ধের কথা উচ্চারণ করেন, তখন মনে হয়, হায়াত খাঁ কমিউনিস্ট-রাজনীতি-প্রভাবিত একটি চরিত্র। কিন্তু পরবর্তীতে হায়াত খাঁ মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির প্রতি আস্থাবান হয়ে ওঠায় এ-সম্পর্কিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আর অবকাশ থাকেনা। তবু ঔপন্যাসিক বিবরণ অনুযায়ী হায়াত খাঁকে একজন জনকল্যাণকামী চরিত্র হিসেবে নির্দ্বিধায় চিহ্নিত করা যায়। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের অতি-আবেগের কারণে এ-চরিত্রটি বিকশিত ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি।

যুদ্ধ-প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের মতামতও এ-উপন্যাসের কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। অবশ্য ভারত-বিভাগ আন্দোলনে এ-দলের তৎপরতার প্রসঙ্গ উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন। এ-সময় কংগ্রেসের পাশাপাশি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। 'অনেক সূর্যের আশা'য় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্যবাহিত একটি এলাকা উদ্ধৃতিযোগ্য : "এমন একটা দেশ হবে পাকিস্তান, যে দেশের জনগণ সব রকম অন্যায় অবিচার এবং শোষণ থেকে হবে মুক্ত, ব্যক্তিস্বার্থ, অদম্য লালসা এবং দারিদ্র্যের ভয় থাকবেনা তাদের। এটা এমন একটা দেশ হবে, ...যে দেশে সম্পদএবং বড় ঘরে জন্ম মানুষের কোনরূপ সহায়তা আনবেনা এবং দারিদ্র্যও দেবেনা কোন প্রতিবন্ধকতা। যেখানে নগণ্য দরিদ্রের সন্তানও তার মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণের ও বড় হবার সব রকম সুযোগ সুবিধা পাবে। ...অসংখ্য কোটিপতির দেশ সে না হতে পারে; কিন্তু সে দেশে একটা লোকও অভুক্ত রাত্রিযাপন করবেনা।"[৫০]

সুচতুর জিন্নাহর এ-ধরনের বক্তব্যে আকৃষ্ট হয় সরলপ্রাণ মুসলিম জনসাধারণ। 'অনেক সূর্যের আশা'য় কবি নিজাম, কাজী গিয়াসউদ্দীন, আবদুল হামিদ, ভীমরুল ও জামরুল মুসলিম লীগেরই সে-সব সচেতন-প্রতিনিধি যাঁরা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছিলেন সতত উদগ্রীব। তাদের আবেগ আর উত্তেজনাকে সম্বল করে এ-সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থতার সুযোগ পান, এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের মুখরোচক শ্লোগান নিয়ে রাজনীতিতে অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মহাত্মা গান্ধী যে-সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, ঠিক সে-সময় জিন্নাহ নিয়ে এলেন সম্প্রদায়-বিভাজনের হীন বক্তব্য। যার ফলে একই ভূখণ্ডে বসবাসরত দু'ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসার বীজ রোপিত হয়, এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প পুরো ভারতবর্ষের জনজীবন অশান্ত করে তোলে। কূটবুদ্ধি রাজনীতিকদের প্ররোচনায় জনগণ লিপ্ত হয় আত্মদানের পরিবর্তে আত্মহননের অশুভ প্রতিযোগিতায়। শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের মন ও মস্তিষ্ক থেকেও আধুনিক সমন্বিত জাতিক চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হয়, এবং তার স্থান অধিকার করে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব। 'অনেক সূর্যের আশা'য় সরদার জয়েনউদ্দীন সে-সব ভয়াল ও উত্তেজনাময় দিনগুলো বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন :

> রোজ খবরের কাগজে জোর-খবর বেরুচ্ছে, অমৃতসর, জুলান্ধর, মুলতান, রাউলপিণ্ডি এমনি করে দুদিনের মাঝে পাঞ্জাবের শহর থেকে শহরান্তরে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিল শিখেরা। হাজার লোক নিহত হয়েছে এক অমৃতসরে—তাও একদিনে।
>
> ধীরে ধীরে কলকাতার বায়ু দূষিত হয়ে উঠলো, পাঞ্জাব থেকে যে বিষবাষ্পই ছেড়েছে শিখেরা তার যেন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। তারপর এক দিন সত্যি এখানে সে আগুন জ্বলে গেল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। মানুষ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে শুরু করে দিল।
>
> খবরের কাগজে পড়লাম, বিহারে দোজখের আগুন জ্বলছে। হাহাকারে সেখানকার আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে।[৫১]

কলিকাতায় সংঘটিত দাঙ্গার একটি মুহূর্ত লেখক অত্যন্ত জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করেছেন: "সেদিন কলকাতায় ধুম রায়ট। সারাদিন আগুন জ্বলছে এখানে সেখানে, খুনোখুনিও হয়েছে প্রচুর। রাত প্রায় এগারোটায় ঘরে শুয়েই শুনছি, নারায়ে তকবির আর বন্দে মাতরম। দু'দলের হাঙ্গামা বাধানোর আগের হুঙ্কার। এমন সময় এক কাণ্ড। আমার পূর্ব দিকের কোয়ার্টারগুলোর ওদিক থেকে হৈ হুল্লোড়। দরজা খুলে বাইরে এলাম। ভয়ানক জটলা, কে নাকি ছোরা না লাঠি হাতে ও কোণের ব্যানার্জীর কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল তাকে খুন করতে। নিশ্চয়ই একবালপুর থেকে মুসলমানেরা এসে ওঁৎ পেতে ছিল।"[৫২]

অবশেষে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, চারিত্রধর্মের স্খলন-পতন, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দ্বিজাতিতত্ত্বের খড়্গে ভারতভূমি হলো দ্বিখণ্ডিত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগষ্ট রক্ত আর অশ্রুর সাগরে স্নান করে জন্ম নিলো ভারত আর পাকিস্তান। রহমত, ভীমরুল, জামরুল, কবি নিজাম, কাজী গিয়াসউদ্দীন, হায়াত খাঁ, হেনার মা সবাই চলে এলো স্বপ্নের দেশ পাকিস্তানে। এতদ্‌প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্র রহমতের আত্মভাবনা উল্লেখযোগ্য: "তখন সুবেহ সাদিকের আলোয় আলোয় পূর্ব আকাশ আলোর বন্যায় নেয়ে উঠছে, ঝলমল করে রেঙে উঠছে দিগন্ত। মনে মনে কেবলি ভাবছি, ঐ ওখানে ঐ আলোর পারে সে দেশ—সে স্বপ্নের দেশ—সে আজাদ দেশ আমার! যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, নেই অভুক্ত জন-মানব। গরীব-কাঙাল, রাজা-জমিদার সব সেখানে সমান, সব একই মানুষ!"[৫৩]

পাঁচ

'অনেক সূর্যের আশা'য় প্রলুব্ধ হয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে-পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করলো, সে-পাকিস্তানে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে বিধ্বস্ত হলো তার বিশ্বস্ত বর্ণনায় সমৃদ্ধ 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' (১৯৭৫)। এটি সরদার জয়েনউদ্‌দীনের সর্বশেষ উপন্যাস।'অনেক সূর্যের আশা' এবং 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ'-এর মধ্যবর্তী সময়-পরিসরে তিনি লিখেছেন 'বেগম শেফালী মীর্জা' এবং 'শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলি'। তবু 'অনেক সূর্যের আশা' উপন্যাসের সঙ্গে 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ'-এর

আলোচনা সংযোজন করবার প্রধান এবং একমাত্র কারণ—দু'টো উপন্যাসের কাহিনী ও বিষয়গত ঐক্য। 'অনেক সূর্যের আশা'র সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এ-উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে। সরদার জয়েনউদ্‌দীন এ-প্রসঙ্গে বলেছেন: "বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' মূলতঃ আমার উপন্যাস 'অনেক সূর্যের আশা'-এর দ্বিতীয় খণ্ড। এখানেও সমাজ উজ্জীবনের মানস প্রায় একই। পূর্বতন কুশীলবদের অনেকেই এখানেও ক্রিয়াশীল। কেবল ভীমরুল ও জামরুল কলিম ও হাতেম এই নব নামে নামায়িত হয়েছে। তবু এর ভিন্ন নামকরণের কারণ দেখা দিয়েছে এ জন্যে যে, এ উপন্যাসের পটভূমি, সমাজ ও শোষণ ভিন্নধর্মী এবং বিষয়বস্তু, জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি নবতর।"[৫৪]

তাই বলা যায়, 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' মূলতঃ 'অনেক সূর্যের আশা'রই পরিণত ও চূড়ান্ত রূপ। অবশ্য 'অনেক সূর্যের আশা'র মতো ব্যাপক সমাজ-চিত্র এতে নেই। এ-উপন্যাসের ব্যাপক পটভূমিতে অঙ্কিত হয়েছে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে শাসকচক্রের শাসন ও শোষণ, বাম-রাজনীতির ক্রম-উত্থান, তেভাগা আন্দোলন, ভাষাবিপ্লব প্রভৃতি বিচিত্র প্রসঙ্গ।

'অনেক সূর্যের আশা'র মতো এ-উপন্যাসেরও কেন্দ্রীয় চরিত্র রহমত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রহমতের সক্রিয় ভূমিকা না থাকলেও 'অনেক সূর্যের আশা' পর্যায়ে রহমত ছিলো মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতাত্ত্বিক ধারণায় বিশ্বাসী। অবশ্য সে-সময় মুসলিম লীগের দ্বিজাতিত্ত্ব শ্লোগানের কূটজালে জড়িয়ে যায় ভ্রান্তবুদ্ধি মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়। "শিক্ষিত মুসলিম ছাত্র যুবক শ্রেণী এবং চাকরিজীবি মুসলমানদের পক্ষে এ সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি যে, ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে শোষক-শাসকগণ একটি আলাদা অর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক শ্রেণী। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ওপর প্রভুত্ব অব্যাহত রেখে তাদের রক্ত শোষণ করাই ওদের একমাত্র ধর্ম। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাই সহজেই নেতিবাচক প্রচারণার শিকার হয়।"[৫৫] 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' উপন্যাসের কলিম-হামিদরাও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে উৎসর্গ করে। শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠনের ব্যাখ্যা যে অবৈজ্ঞানিক ও বিভ্রান্তিকর তা' তারা বিস্মৃত হয়। কিন্তু ১৯৪৭-এর ২২ আগস্ট রেডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে যখন ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্ত নির্ধারিত হয়, এবং কোনো প্রকার বাদ-প্রতিবাদ

ছাড়াই মুসলিম লীগের স্বার্থন্বেষী চক্র এ-সীমান্ত নীতি মেনে নেন, তখনই মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের মোহভঙ্গ ঘটে। অতঃপর তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে আবিষ্কার করে সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম পুঁজিপতি, সামন্তপ্রভু আর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অশুভ আঁতাত। তাই পাকিস্তান-আন্দোলনে প্রত্যয়ীকর্মী কলিম (ভীমরুল) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরে সখেদে উচ্চারণ করে :

> আসাম গেল, পাঞ্জাবের অর্ধেক গেল, আর বাঙলার গেল জানটাই। এ পাকিস্তান নিয়ে আমরা ধুয়ে খাব নাকি ? লোকে অনুকম্পা করে যে পুরস্কার দেয়, ঐ যাকে বলে কনসোলেশান প্রাইজ, এও যে তাই।[৫৬]

'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' উপন্যাসে সরদার জয়েনউদ্‌দীন এভাবে তৎকালীন যুব-মানসের বিক্ষুব্ধ মানসিকতা চমৎকারভাবে পরিবেশন করেছেন। এ-সময় যুবসম্প্রদায়ের একাংশ ভারত-বিভাজনের মধ্যে আবিষ্কার করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ষড়যন্ত্রমূলক অভিপ্রায়। এতদ্‌প্রসঙ্গে কলিমের মন্তব্য স্মর্তব্য : "ভদ্রলোক বাঙালী মুসলমানকে ছিন্নমূল বৃক্ষে রূপান্তরিত করে দিল। সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে কাজটা করেছে।...যে স্বাধীন বাসভূমির জন্যে হাজার হাজার বাঙালী অকাতরে প্রাণ দিল, সেটাও পেল না পাওয়ার মত করে, আর প্রাণ দেওয়ারও শেষ হলোনা। এই প্রাণ হারানোর ঢেউ কবে যে শেষ হবে, আর শেষ হবেই কি না তা একমাত্র ভবিতব্যই জানে।"[৫৭] অবশেষে কলিমের এ উপলব্ধি ও উৎকণ্ঠাই সত্য হয়। অবিলম্বে পাকিস্তানী শাসকচক্র বাঙালির আবহমান সভ্যতা কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়। হামিদ, মনোয়ার জাহান চৌধুরী, মোদাচ্ছের আলি, হাতেম প্রমুখ তরুণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কৃত্রিমতা অনুধাবন করতে পারে। তারা বুঝতে পারে, ধর্ম নয়, "একটা জাতিগঠনের জন্য চাই অখণ্ড ভৌগোলিক নির্দিষ্ট সীমারেখা, চাই অস্থিমজ্জায় প্রবাহিত এক দীর্ঘ মানস-ইতিহাস, প্রয়োজন একটা ভাষা, প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর অভিন্ন অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি।"[৫৮] কলিমের বক্তব্য এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : ... বিশ্বমুসলিম এক হও যারা বলে, তারা আরব দেশের তমদ্দুন দিয়ে বাংলার সংস্কৃতিকে পাল্টাতে চায়। কিন্তু বোকা জানেনা, সংস্কৃতি ভৌগোলিক পরিবেশের দান, দেশজ। একে অন্য দেশের অন্য আবহাওয়ার প্রকৃতি দিয়ে পরিবর্তন করা

যায় না। তাছাড়া ভাষা, ভাষার প্রশ্নে কোন আপোষ থাকতে পারে না। বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষা তার অর্থই হচ্ছে বাঙালী জাতির উপরে অন্য জাতির প্রাধান্য, এবং বাঙালীর মৃত্যু,..."[৫৯] যে-সময় বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ আত্ম-আবিষ্কারে উন্মুখ, ঠিক সে-সময়ে এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসক সম্প্রদায় ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে, এবং বাঙালির কণ্ঠরোধ করবার হীন ও জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে, বাংলা ভাষার মধ্যে আবিষ্কার করে হিন্দুয়ানির গন্ধ; এবং সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানের একাংশের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। মনোয়ার জাহান চৌধুরীর বক্তব্য এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা রাখা হবে কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই। কেননা, ভেতরে ভেতরে এটা স্থির হয়ে গেছে, পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা হবে উর্দু। তাঁদের ধারণা বাঙালী মুসলমানরা ধর্মে মুসলমান হলেও আচার আচরণে হিন্দুই রয়ে গেছে এবং এর মূলে রয়েছে বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতি। অতএব সেটা বদলাতে না পারলে বাঙালী মুসলমান খাঁটি পাকিস্তানী হয়ে উঠবে না।[৬০]

এভাবেই পাকিস্তানী শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়-তাবাদের ধ্বনি বাঙালি বিদ্বেষে পরিণত হয়। বাঙালিরাও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করে তাদের বিপন্ন ভবিষ্যৎ। আশা আর আশঙ্কায়, ক্ষোভে আর আক্রোশে তারা যখন রুদ্ধবাক, ঠিক তখনই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্যে তারা অনুভব করলো প্রলয়ের পূর্বাভাষ। ঢাকায় এসে এ-সময় তিনি যে-উক্তি করেন তা' সরদার জয়েনউদ্দীন তুলে ধরেছেন এভাবে :

> ভারতীয় শত্রুরা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে। তারা ভাষার প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। দু'টো রাষ্ট্রভাষার কথা বলছে। আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একটি এবং সে হবে উর্দু, কেবল মাত্র উর্দুই, অন্য কোনো ভাষা নয়।
>
> আমি জানি, কিছু সংখ্যক অন্তর্ঘাতক হিন্দুদের এজেণ্ট হিসেবে কাজ করছে। তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।[৬১]

বাঙালি জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করবার অভিপ্রায়ে শুধু ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতিই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে সক্রিয় হয়ে ওঠে অবাঙালি শোষকশ্রেণী এবং তাদের অনুগ্রহ-ধন্য শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরা। যার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বঞ্চিত ও নিগৃহীত হতে থাকে বাঙালিরা। বেকারত্বের নির্মম দহনে দগ্ধ হতে থাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ সম্প্রদায়। লেখকের কথায় :

> আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চাকরী বাকরীর চেষ্টা যে করছেনা তাও নয়। পাবনার সেই হঠাৎ ছাত্র নেতা ফ্যাক-ফ্যাকে মোদাচ্ছের আলী, এলোপাথারি গুলি চালানোর মত অনবরত আবেদন পেশ করে চলছে। সব দরখাস্তে সে বোল্ড অক্ষরে উল্লেখ করতো, এ্যাজ ফর মাই কোয়ালিফিকেশানস আই রিসিভড এ বুলেট শট ডিউরিং দি মুসলিম ষ্টুডেণ্টস লীগ মুভমেন্ট। আরও দু'একজন মন্ত্রী পর্যায়ে ধন্না-ধান্না দিচ্ছে, তোশামোদ করে ফিরছে, ছোটখাটো একটা চাকুরী টাকুরী হয় কিনা সে আশায়। তা ছাড়া আমরা সবাই নির্লিপ্ত বেকার। অফুরন্ত আল্‌সে অবসর।[৬২]

একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রশাসনে বঞ্চিত ও নিগৃহীত হচ্ছে শিক্ষিত তরুণ শ্রেণী, অন্যদিকে দুর্নীতি-প্লাবিত প্রশাসনের ছত্রছায়ায় স্ফীত ও বর্ধিত হচ্ছে আরেক সুবিধাভোগী শ্রেণী। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমূল বিচ্ছিন্নতাই এদের একমাত্র যোগ্যতা। ফলে দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতি বৃদ্ধি পায়, চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে নেপোটিজম।

এভাবে বহুমুখী বঞ্চনার মধ্য দিয়ে বাঙালিরা এ-সত্য অনুধাবনে সক্ষম হয় যে, দেশ-বিভাগই প্রকৃত মুক্তি নয়, মুক্তির বীজমন্ত্র নিহিত রয়েছে একটা শোষণহীন সমাজব্যবস্থায়। প্রতিরোধ আর সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল এ-রকম সমাজ অর্জিত হতে পারে, এবং সত্যিকারভাবে শিক্ষিত ও আদর্শ-বাদী তরুণদের পক্ষেই এ-সমাজের গোড়াপত্তন সম্ভব। তদুপরি পরিবর্তনের জন্য চাই সামাজিক সাম্য। এ-প্রসঙ্গে কলিমের মন্তব্য স্মর্তব্য : "সংগ্রাম হচ্ছে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার, সে সংগ্রাম শোষণের বিরুদ্ধে, মানুষকে যারা গোলামীতে অভ্যস্ত করে তুলেছে, বিত্তহীনে পরিণত করছে, তাদের বিরুদ্ধে। ... তাছাড়া সাম্যবাদের কথা শুনলেই যারা ইসলাম গেল বলে আতঙ্কে ত্রাহি চীৎকার করে ... তারা আসলে ইসলামের মুখোস

পরে নিজেদের স্বার্থের জন্যেই ব্যস্ত। কেননা, ইসলাম ব্যক্তি স্বার্থের জন্যে নয় এবং সাম্যবাদের পরিপন্থিও নয়। বরং ইসলাম অনেকাংশে সাম্যবাদের সমর্থনই জুগিয়েছে।"[৬৩] এভাবেই মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমশঃ বামপন্থী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এ-আন্দোলনের প্রতি আস্থাশীল তরুণ সম্প্রদায় আন্দোলনের পাশাপাশি সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কারণ তাদের বিশ্বাস গণসাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা ব্যতীত গণ-চেতনার জাগরণ অসম্ভব। এতদ্‌প্রসঙ্গে লেখক 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ'তে যে-সব তরুণ রাজনীতিকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন—সুজিত দা, মাজেদ চৌধুরী, অসীম চক্রবর্তী, হাবিব আনোয়ার, আজিজ মেহের, সরদার ফজলুল করিম প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ অধ্যয়ন, কেউ অধ্যাপনা, কেউ শিল্প, কেউ চিকিৎসক—ইত্যাকার পেশার সঙ্গে জড়িত। সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে এ-আন্দোলন যে বিস্তৃত হচ্ছিলো তা' এঁদের পেশাগত পরিচয়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট। বামপন্থী চিন্তা-চেতনা যখন বিকাশোন্মুখ ঠিক তখনই এদের মধ্য থেকে আবির্ভাব ঘটে কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক বিভীষণের। এরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে দেশাত্মবোধ জলাঞ্জলি দেয়, এবং পাপপঙ্কিল পথ অনুসরণের মাধ্যমে সম্পদ-সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে। হামিদের ভাষায় :

> ব্যক্তিস্বার্থ মানুষকে কেবল অন্ধকারে ঠেলে দেয়, .. এমন যে মনোয়ার জাহান চৌধুরী, যিনি বাংলা ও বাঙালী বলতে অজ্ঞান, তিনিও পাপের কাদায় বুক পর্যন্ত ডুবে গেছেন। ইদানিং এখানে এসে যে কয়েকদিন থাকেন, প্রকাশ্যে তোমাদের নিকট যাই বলুন না কেন, ভেতরে নাজিমুদ্দিন সরকারের মুসলিম ছাত্র লীগের সমর্থক হয়ে কাজ করছেন। লোকটা কি সাংঘাতিক। লোভ তাকে কোথায় টেনে নামিয়েছে। ... শেখ মুজিব, তোয়াহা, আলি আহাদ, তাজউদ্দীন প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ মোটেই সহ্য করতে রাজী নয়। বলে রাজনৈতিক বিভীষণ। গোপনে গোপনে শাহ আজিজের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে।[৬৪]

সামাজিক-রাজনৈতিক-সংঘশক্তির অনিবার্য টানে ব্যক্তিমানুষ যে কিভাবে সমস্ত জঞ্জাল ঝেড়ে শুদ্ধ-পবিত্র ও পরিবর্তিত সত্তায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত ছমির মিয়া। সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলনে সেও অবশেষে অংশ গ্রহণ করে এবং অচিরেই ত্যাগী-কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে

সক্ষম হয়। পরিবর্তন-স্রোতে আন্দোলিত ছমির মিয়া তাই বলে: "শুনলাম, শীগগিরই নাকি জিন্না ব্যাটা আসছে। তোমরা সব বেকার মিলে ধন্না দাও, রাস্তা-ঘাট থেকে বাস্তুহারাদের গুছিয়ে নিয়ে যাও, বলো পাকিস্তান তো হাসিল হলো, এখন চাকরি দাও, খাবার দাও, মাথা গুঁজবার ছাউনী দাও। তোমায় ছাড়ছিনা। তখন না বড় গলা করে বলেছিলে পাকিস্তান কায়েম হলে দারিদ্র্য, দুঃখ, উপবাস, ঘৃণা-বিদ্বেষ বলে আর কিছু থাকবে না। বড়-ছোট ভেদাভেদ ঘুচে যাবে। কৈ এখন দেখছি বড় আরও বড় হচ্ছে, ব্যাপারটা কি।"[৬৫] শুধু শঠ ও প্রবঞ্চক শাসক-শোষকদের প্রতি বিদ্বেষই নয়, ছমির মিয়া এ-সময়কালে হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ চরিত্রধর্মের উপাসক। অতীতের ক্লেদ-পঙ্কিল জীবনচর্যার স্মৃতি স্মরণ করে তাই সে অনুতপ্ত হয়। হেনার মায়ের প্রতি কৃত অপরাধের জন্য সে অন্তর্জগতে ক্ষতবিক্ষত হয়, এবং নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে:

> ...একদিন তাকে (হেনার মা) ভাল লেগেছিল, ... আবেগে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তারপর তার যে মূর্তি দেখেছিলাম, সে মূর্তি আরও ভালো লেগেছিল। কিন্তু আমি একটা অতি খচ্চর লোক সেই ভালো লাগার প্রতিদান দিয়েছিলাম প্রতিহিংসা দিয়ে,—তার, নাবালিকা মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। সে জন্যেই তো তাকে নিয়ে এসে আজ সে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করছি।[৬৬]

এ-ছমির মিয়া পরিশেষে রূপান্তরিত হয় একজন নিবেদিত-প্রাণ বিপ্লবী-কর্মী হিসেবে।

যে-শক্তির টানে ছমির মিয়া বদলে যায়, সে-শক্তিই তার আপন নিয়মে বদলে দেয় অসংখ্য মানুষ। শুধু শহরই নয়, গ্রামও এ-সময় তার সমস্ত আয়োজন নিয়ে মুখর হয়ে ওঠে। 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' উপন্যাসে সরদার জয়েনউদ্‌দীন শাহরিক জীবনের পাশাপাশি সামসময়িক গ্রামীণ জীবনের উন্মুখর জীবনবাস্তবতার স্বরূপও অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছেন। পাকিস্তানী শাসকসম্প্রদায়ের বৈষম্যমূলক আচরণে এ-সময় গ্রাম থেকে স্বস্তি ও শান্তি প্রায়-নির্বাসিত। গ্রামীণ সহজ-সরল-

অজটিল জনসাধারণও সমস্ত ষড়যন্ত্রের উৎসমূল আবিষ্কারে সক্ষম হয় এবং ক্ষোভে ও বিক্ষোভের সঙ্গে গেয়ে ওঠে :

পেলাম স্বাধীনতা খাসা,
স্বাধীন দেশে উপবাসে
মরছে যতো গরীব চাষা।[৬৭]

সরদার জয়েনউদ্দীন এ-পর্যায়ে তাঁর স্বগ্রাম কামারহাটের দুঃসহ জীবন-যাপনপ্রণালী অঙ্কনসূত্রে 'কৃষক সমিতি' নামক একটি সংগঠনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। "রাজনীতির ছাত্রমাত্রই বোধ হয় জানেন যে, অবিভক্ত বাঙলায় ১৯৪৬-৪৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টি'র গণসংগঠন 'কৃষক সভা'র নেতৃত্বে জমিদার-জোতদারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙলা দেশব্যাপী পরিচালিত হয় বঞ্চিত ভাগচাষী ও ক্ষেত-মজুরদের এক বিরাট গণসংগ্রাম। কৃষক সভার নেতৃত্বে উত্তর বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে—বিশেষ করে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী আর মালদহ জেলায় এই আন্দোলন দুর্বার জঙ্গী গণ-সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। দিনাজপুরের ভাগচাষী রাজবংশী সম্প্রদায় এবং রাজশাহী-মালদহের সাঁওতাল ভাগচাষীরা এই তে-ভাগা আন্দোলনে যেন তাঁদের সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সশস্ত্র পুলিশ-মিলিটারীর বন্দুক-বেয়োনেটের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কৃষক জনতা লাঠি-বল্লম, তীর-ধনুক নিয়ে প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালিয়ে যান। আর, এই অসম যুদ্ধে সমীরুদ্দিন, জিতু সাঁওতাল প্রমুখ বীর কৃষক-সন্তানেরা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তাঁদের সহযাত্রী-সহকর্মীদের জন্য রেখে যান এক নতুন সংগ্রামী ঐতিহ্য। ...ইংরেজ আমলে নাচোল ও নবাবগঞ্জ থানার বিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী সাঁওতাল কৃষক একই তে-ভাগা সংগ্রামে মিলিত হয়ে দেশ-বিভাগের পর ঐ অঞ্চলে গড়ে তোলেন এক শক্তিশালী সংগ্রামের ঘাঁটি। রাজশাহী জেলার কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রমেন মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী ও আজহার হোসেন লীগ-সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে ১৯৪৯ সালে বিভাগোত্তর কালের তে-ভাগা সংগ্রামে ঐ অঞ্চলে নেতৃত্ব দিতে থাকেন।[৬৮] কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বাধীন কৃষক সভার এ-কার্যক্রমের সঙ্গে 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ'-উপন্যাসস্থিত 'কৃষক সমিতি'র আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

যারা সরকার গঠন করছে, তারা সবাই জোতদার—তালুকদার, জমিদার-মহাজন আর নবাব-বাদশার জাত, জমির আসল মালিকই

> তো তারা। নিজের পায় কুড়ুল তারা কেনো মারবেন। এ যাদের সমস্যা সেই ভাগ চাষীদেরই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাদের সবাইকে এক হতে হবে। ...সব ভাগচাষী এক হও।... যতোক্ষণ আমরা তাদের বাধ্য না করছি, ততোক্ষণ তারা আইন পাল্টাবে না। আমরা চাইবো, জমি চাষ করে যে, জমির আসল মালিক সে। যতোদিন সে আইন না হবে, ততোদিন অন্ততঃ তিনভাগের দুই ভাগ ফসল তো চাই-ই।৬৯

কিন্তু না, প্রত্যাশা সফল হয়নি কৃষকের; পুলিশী অত্যাচার ও নিপীড়নে তারা শেষ পর্যন্ত পিষ্ট ও চূর্ণ হয়ে যায়, নিহত হয় অনেকে, অনেকেই বরণ করেন অকাল পঙ্গুত্ব। যারা বেঁচে আছে তারা ক্ষোভ আর বেদনা নিয়ে অপেক্ষা করে, আর সুযোগ খুঁজে আন্দোলনের।

গ্রাম ও শহরের এ উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ সরকার সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মরিয়া হয়ে বায়ান্নর ২৬ শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা-প্রশ্নে আবার বিতর্কের ঢেউ তুললেন এবং বললেন "উর্দু, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।"৭০ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে ফেটে পড়লো বাঙালি। "মন হতে মনে আগুন ছড়িয়ে গেল, কণ্ঠ সোচ্চার হলো ছাত্র-শ্রমিক, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-কোবরেজের। চারদিকে ধর্মঘট, ধর্মঘট, আর ধর্মঘট। এমন জালেম সরকার—যে মায়ের ভাষা, স্বপ্নের ভাষা কেড়ে নিতে চায়, তাকে আমরা মানবোনা। সংগ্রাম—সংগ্রাম। স্কুল-কলেজ, দোকান-বাজার, মিল-কারখানায় তালা, পথে পথে শোভাযাত্রা ...প্রতিবাদ।"৭১ অবশেষে বন্দুক-বেয়োনেট-গুলি আর হত্যার মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তানী শাসকচক্র প্রকারান্তরে পাকিস্তানেরই মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করলো এবং উদ্বোধন করলো বাঙালি জাতিসত্তার।

উপর্যুক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রধান উপন্যাস। প্রায়-সমকালে সংঘটিত কতকগুলো বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা তিনি অত্যাশ্চর্য দক্ষতায় এ-উপন্যাসে স্থাপন করেছেন। ঘটনাপ্রধান এ-উপন্যাসে লেখকের মানস-উজ্জীবনের প্রসঙ্গই শুধু নয়, একটি জাতিসত্তার উজ্জীবন ও উত্তরণের ইতিকথাও চিহ্নিত হয়েছে। এদিক থেকে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে বাঙালি জাতিসত্তার উজ্জীবনের ইতিহাস।

ছয়

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'বেগম শেফালী মীর্জা' (১৯৬৮) গ্রাম ও শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত। এ-উপন্যাসে পরস্পর সংলগ্ন দুটো কাহিনী অস্তিত্বমান : একটি বেগম শেফালী মীর্জা-সংক্রান্ত, অন্যটি জালালীবু-সংক্রান্ত। এ-দুই নারী-চরিত্রের সঙ্গে দু' ভিন্ন পরিবেশে সম্পর্কিত ছিলেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রশীদ বিশ্বাস। উপন্যাসটির নাম বেগম শেফালী মীর্জা হলেও এর অধিকাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে জালালীবু। জালালীবু মফস্বলীয় একটি চরিত্র, যার সঙ্গে রশীদ বিশ্বাসের প্রথম যৌবনের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা অনেক স্মৃতি বিজড়িত। জালালীবু-প্রসঙ্গটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় চরিত্রের দ্বিধাগ্রস্ততা ও ক্লীব-মানসিকতার স্বরূপ অঙ্কনে সক্ষম হয়েছেন লেখক। তদুপরি একান্তই স্বপ্নবিহারী রশীদ বিশ্বাস কিভাবে প্রত্যাশিত সি. এস. পি. হওয়ার পরিবর্তে সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়েছেন, তা' উপস্থাপন করতে গিয়ে সরদার জয়েনউদ্‌দীন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের স্বরূপ-সত্য উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন।

বিত্ত ও বিদ্যার সম-সংযোগ না ঘটলে ব্যক্তিমানুষ যে পদে পদে বিপর্যস্ত ও বঞ্চিত হতে বাধ্য, 'বেগম শেফালী মীজা'য় এ-সত্যই ব্যঞ্জিত হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও রশীদ বিশ্বাস বারবার চলার পথে থমকে গেছে ; হার্দ্য প্রত্যাশা পরিপূরণে হয়েছে ব্যর্থ। বাল্যবেলা থেকেই সে অভাব-অনটন-দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচিত। কোনো প্রকার উচ্চাভিলাষ থেকে নয়, শুধুমাত্র পিতা বশির বিশ্বাসের ইচ্ছায় সে ভর্তি হয়েছে স্কুলে। কারণ :

> আব্বা ভেবেছিলেন, ছেলেটা কোনমতে ম্যাট্রিকটা ডিঙাতে পারলে কালেক্টরীতে একটা কেরানী বাবুর কাজ ধরে দিতে প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে হাতে পায়ে ধরে বলবেন। তা যদি নেহাত না হয়, প্রাইমারী স্কুলের ষাট টাকার মাষ্টারী তো পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে ভদ্দর লোকদের ছেলেমেয়ে সকাল-সন্ধ্যা-রাত তিন বেলা পড়ালে আর বিশ তিরিশ কি না হবে !...
>
> এসব ভেবে চিন্তে আব্বার ধারণা হয়েছিল, আমি ম্যাট্রিকের বাঁধটা ডিঙাতে পারলেই আব্বার নড়বড়ে সংসারে একটা শালের খুঁটি না হোক তালের খুঁটি হয়ে হিল্লে দিতে পারবো।[৭২]

কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনটি লেটারসহ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ রশীদ বিশ্বাসকে অবশেষে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার আকাঙক্ষায় জেলা শহরের দিকে ধাবিত হতে হয়। এতদ্‌প্রসঙ্গে রশীদ বিশ্বাসের ভাষ্য উল্লেখযোগ্য :

> একদিন সকালে টিনের একটা নতুন স্যুটকেসে (মনে পড়ে মস্ত গোলাপ ফুল আঁকা ছিল তার উপরে) দুখানা লুঙ্গী, একটা হাফ প্যান্ট আর একখান গামছা আটকে নিয়ে নতুন পাজামা পরে টিমটিম পায়ে আব্বার হাত ধরে গাঁ থেকে পঁচিশ মাইল দূরে জেলা শহরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। কলেজে পড়বো। আব্বার ফুফাতো ভাই করিম চাচাও সঙ্গে গেলেন। করিম চাচার মামাতো শালীর বিয়ে হয়েছে শহরে। স্বামীর নাম নাসির মিয়া। খুব বড়লোক, সে বাড়ীতে আমার জায়গীর হবে।[৭৩]

নাসির মিয়ার পরিবারে আভিজাত্য আর প্রাচুর্য দেখে এ-ই প্রথম রশীদ বিশ্বাস নিজেদের আর্থিক দৈন্যের কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। যার ফলে মানসিক দিক থেকে সে হয়ে পড়ে সঙ্কুচিত। অর্থ যে ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি তা' সে শুধু অনুধাবনই করে না, নিজেও সে-জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। এখানে জালালীবু'র সহৃদয়-পরিচর্যায় সে অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে। জালালীবু'র প্রতি অত্যধিক নির্ভরতার ফলে রশীদ বিশ্বাসের চরিত্রে এ-সময় অঙ্কুরিত হয় ভয়-সঙ্কোচ ও দ্বিধা-দৌর্বল্যের বীজ। কিন্তু বাহ্য আচার-ধর্মের আড়ালে জালালীবু যে দিনে দিনে রশীদ বিশ্বাসের প্রতি হার্দ্য-আকাঙক্ষায় নিবেদিত হতে পারে, কোনোদিন তা' অনুধাবনে সচেষ্ট হয়নি রশীদ বিশ্বাস। এ-প্রসঙ্গে তার অন্তর্গত উচচারণ উদ্ধৃতিযোগ্য : "দরিদ্র হয়ে জন্মানো, আর সি. এস. পি. হবার অদম্য আকাঙক্ষা এ দুই-ই বুঝি সেদিন আমার মনকে মানুষের মন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সেদিন আমি দারিদ্র্যকে ভয় করেছিলাম, আর অর্থ-মান-প্রতিপত্তি নিয়ে কেবল বড়ই হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মানুষ হতে চাইনি—তাই-ই বুঝি এ দুইয়ে মিলে আমাকে মানুষের সুন্দর জীবন থেকে দূরে ছিটকে ফেলে দিয়েছে।"[৭৪] রশীদ বিশ্বাসের এ-পর্যায়ের মানস-স্বরূপ অনুধাবনের প্রয়োজনে আরেকটি বক্তব্য স্মর্তব্য :

> এ সময় আমি একটা প্রশ্ন কিন্তু মন থেকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারতামনা। সে হচ্ছে, এ সংসারে আমার মত গরীবরা কতকাল

আর বড়লোকদের খেয়াল-খুশির, দয়ামায়া, ক্ষোভ-অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকবে ? আমাকে সি. এস. পি. হতেই হবে।

এ প্রশ্ন এবং এ প্রতিজ্ঞাই আমাকে জালালীবু থেকে আরো দূরে ঠেলে দিত—সি. এস. পি. হবার, বড়লোক হবার নেশা মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বাঁধতো।[৭৫]

সি. এস. পি. আর সম্পদশালী হওয়ার অদম্য আকাঙক্ষায় মফস্বলীয় জীবন আর জালালীবুকে পরিত্যাগ করে, কলেজীয় পাঠ সমাপ্ত করে রশীদ বিশ্বাস অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্স-এ ভর্তি হয়। অনার্সে প্রথম ক্লাস প্রাপ্তির পর এম. এ. ক্লাসে এসে সে জড়িয়ে পড়ে ধনী-তনয়া শেফালী মীর্জার সঙ্গে। এ-পর্যায়ে এসে রশীদ বিশ্বাসের দীর্ঘদিনের লালিত সংকল্প দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। শুধু সি. এস. পি-ই নয়, সে জীবনের সঙ্গে লগ্ন করতে চায় সহপাঠিনী শেফালী মীর্জাকে। কিন্তু এম. এ. ক্লাসের অপ্রত্যাশিত ফলাফল তার জীবনে নিয়ে আসে দুর্বহ ব্যর্থতা ; পরিণামে তাকে হারাতে হয় সি. এস. পি-র লোভনীয় চাকরী, আর শেফালী মীর্জাকে।

একথা ঠিক যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিত্তহীন ব্যক্তি পালছেঁড়া নৌকার মতো। বিত্তই এখানে ব্যক্তির গন্তব্য নির্ধারণ করে ; নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির মনোময় আকাঙক্ষা। যে-একটিমাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রশীদ বিশ্বাস জালালীবু'র প্রতি অমনোযোগী ছিলো, সে-উদ্দেশ্য সম্পাদনে ব্যর্থতার কারণেই পরবর্তীতে সে শেফালী মীর্জাকে অধিগত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মূলে আর যাই হোক, অর্থনৈতিক বৈষম্যই প্রধানতঃ দায়ী। 'বেগম শেফালী মীর্জা'য় সরদার জয়েনউদ্‌দীন চেতন-অবচেতনে সম্ভবতঃ এ-বক্তব্যই প্রতি-পাদন করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

সাত

'শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলি' স্বাধীনতা-উত্তরকালে মূল্য-বোধের অবক্ষয়, যুবসম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা, অধঃপতন ও বিকৃতি নিয়ে রচিত একটি উপন্যাস। এ-উপন্যাসে শ্রীমতী ক-এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্র রশীদ আহম্মদের বিকৃত যৌনাচারের প্রসঙ্গ প্রধান হয়ে উঠলেও স্বল্প-পরিসরে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সে-সব দিনের স্মৃতি মূর্ত হয়েছে,

যখন বাঙালি জাতিসত্তা ছিলো দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল-চক্রের ষড়-যন্ত্রজালে বন্দী। উপন্যাসটি কেন্দ্রীয় চরিত্র রশীদ আহম্মদের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে রচিত। এক শীতার্ত দিনে পাবনা থেকে নগরবাড়ী ঘাটে ফেরীর প্রতীক্ষায় থাকাকালে রশীদ আহম্মদ যে দুঃসহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ছিলেন তা-ই এখানেই উপস্থাপন করেছেন লেখক।

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসনকাঠামোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করে। বাঙালি জাতির এ-অর্জিত বিজয়কে ধ্বংস করবার জন্য শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী প্রতি ক্রিয়াশীল চক্রের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সর্বত্র এ-সময় উদ্ভব ঘটে এক অরাজক পরিস্থিতির। হত্যা-ডাকাতি-লুণ্ঠনে, আগ্নে-য়াস্ত্রের অবাধ-ব্যবহারে বাংলাদেশের জনজীবন থেকে নির্বাসিত হয় শান্তি ও স্বস্তি। গ্রাম ও শহরের মানুষ ভুগতে থাকে চরম নিরাপত্তাহীনতায়; প্রশাসনযন্ত্র হয়ে পড়ে অর্ধ-বিকল। তদুপরি এ-সময়ে সমাজ-পরিবর্তনের নামে রাজনৈতিক অঙ্গনে আবির্ভাব ঘটে একশ্রেণীর লোভী শঠ ও অশিক্ষিত রাজনীতিকের। যার ফলে রাজনীতি তারা চিরাচরিত অবস্থান থেকে নির্বা-সিত হয়; শুরু হয় অস্ত্রের ব্যবহার। এ-রকম এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নগরবাড়ীর নিলক্ষ্যা বালুচরে ঔপন্যাসিক রশীদ আহম্মদ যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা' আকস্মিক বটে, অকল্পনীয় নয়। রশীদ আহম্মদের বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয়:

> ...আমার জীবনে সাক্ষাৎ এরূপ ঘটনা কখনো ঘটেনি। কিন্তু সচরাচর ঘটেছে যে না, একথা হলপ করে বলতে পারবো না। কারণ খবরের কাগজে রোজ সকালে পড়ছি, হাইজ্যাক, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, খুনোখুনি, বাটপারি, বদমাইশি, রাহাজানি এখানে সেখানে অনবরত ঘটছে। পাড়াগাঁয়ে তো তেষ্টানো দায়। ও পুলিশ ফুলিশ থানা ফানা ছেড়ে সন্ধ্যায় পালিয়ে যায়। ...তাছাড়া এসব কর্ম ঘটছে, খুব বেশী করে ঘটছে, বললে সরকার নারাজ হতে পারেন।... কিন্তু যাকগে সে সব কথা। ...নগরবাড়ী থেকে নদীর ভাটিতে মাইল পাঁচেক ধুলো বালি ভেঙ্গে এসে নিলক্ষ্যা বালুচরের ঘাটে বসে আছি। আরিচা থেকে যে ফেরী পৌণে দুটোয় পৌঁছবে তার দিকে দৃষ্টি মেলে তীর্থের কাক হয়ে চাইছি। সেই পৌণে বারোটা

থেকেই বলতে পারেন। কিন্তু ঐ বিশেষ ঘটনা ঘটার জন্যে ফেরী সেদিন দুটো কেন আড়াইটে, তিনটে, সাড়ে তিনটায়ও পৌঁছালোনা।[৭৬]

যদিও প্রতীক্ষার যন্ত্রণা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর, তবুও নিলক্ষ্যার বালুচরে উক্ত ফেরীর জন্য প্রতীক্ষা করেন নিরুপায় রশীদ আহম্মদ ও অন্যান্যরা। সময় গড়িয়ে যায়। রাত যত ঘনিয়ে আসে ততই তারা আতঙ্ক-শিহরিত হয়। অবশেষে ফেরী আসে। আরিচার উদ্দেশে যাত্রা করবার পর জানা যায় ফেরীর বিলম্বের কারণ। মানুষের রক্তে লাল হয়ে আছে ফেরীর পাটাতন। লেখকের বিবরণ লক্ষণীয় :

> অনেক, অনেক মানুষ খুন করেছে ডাকাতরা। মেসিনগানের ব্রাস-স্‌স্‌। ঝাঁক ধরা মানুষের উপরে। বুঝুন অবস্থা। ...ফেরীতে ডাকাতি, এ্যাণ্ড মার্ডার। একটা দুটো নয়, এ ডজন এণ্ড।
>
> এই ফেরীতে সে ঘটনাটা ঘটেছিল দুপুর পৌণে বারোটায়, গোয়ালন্দ থেকে আসবার পথে হেমগঞ্জ বাজারের সামনে, উন্মুক্ত যমুনার বুকের উপর। এই যে লোকগুলো মারা গেছেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মিলিটারী। ...আইন কানুন চাদরে বেঁধে রেখে ডাকাতরা ডাকাতি করছে, খুন জখম, লুট করে বেড়াচ্ছে। কিচ্ছু হচ্ছেনা।[৭৭]

একথা সত্য যে, কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমবিমুখ, লোভী ও তস্কর নেতা-উপনেতার ছত্রছায়ায় এরা চালিয়ে যায় হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস প্রভৃতি অমানবিক ক্রিয়াকর্ম। প্রতিকারের দায়িত্ব যাদের হাতে তারাও নির্বিকার, উদাসীন। জনগণ তাই বিক্ষুব্ধ হয়, আইন তুলে নেয় নিজেদের হাতে। সরদার জয়েনউদ্‌দীন লোকায়ত ভঙ্গিতে এর স্বরূপ উন্মোচন করেছেন : "কিচ্ছু হচ্ছে না, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিনি। হচ্ছে, যখন ঘেরাও হচ্ছে, ধরা পড়ছে। জনতার রুদ্ররোষ তাদের মাথার মগজ ছড়িয়ে দিচ্ছে পথে-ঘাটে, মাঠে-প্রান্তরে। দেহ মিশিয়ে দিচ্ছে, ধূলো-বালি, কাদা-পানিতে। ধরে পুলিশে দিলে, বড়লোকের, কি কোন নেতার আত্মীয় বলে আবার ছাড়া পেয়ে যাবে, আবার শুরু করবে। তার চেয়ে দে একেবারে আল্লার দরবারে পাঠিয়ে, যেন শালা আর কোন খাতিরদার না পায়। সকালে ব্যাঙ্কে, বিকালে

লঞ্চে ডাকাতি, রাতে মটরকার হাইজ্যাক, সালারা বাহাত্তুর সালের বাংলাদেশটা পেয়েছিস কি?[৭৮] অথচ আশ্চর্য, প্রশাসনের প্রায় প্রতিটি স্তর যেখানে দুর্নীতি-কবলিত সেখানে শেখ মুজিব নিষ্পাপ মানুষের সন্ধান করেন। তিনি উদার ভাবে ক্ষমা করেন সে-সব নরপিশাচদের, যারা বিজয়-লগ্নে হত্যা করেছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের; হত্যা করেছে ত্রিশ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ। লেখক তাই করুণ-কাতর কণ্ঠে শেখ মুজিবের কাছে প্রার্থনা করেন :

> তোমার কাছে আমার করুণ আবেদন, তোমার একজন স্নেহান্ধ অনুজের আবেদন, তোমার একজন ভক্তের আবেদন, তোমার সেই আকুল চীৎকারকে চিরদিনের আকাঙক্ষাকে আজ যারা গলা টিপে হত্যা করেছে, তারা তোমার শত্রু, তারা মানবতার শত্রু, তারা দেশের শত্রু। তাদের তুমি ক্ষমা করোনা ভাই। তাহলে, তোমার সব স্বপ্ন বিফল হয়ে যাবে।[৭৯]

সদ্য-স্বাধীন একটি দেশ পরিচালনার জন্য যে-ধরনের সৎ-শিক্ষিত ও ত্যাগী কর্মী-বাহিনীর প্রয়োজন তা' স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ছিলো অকল্পনীয়। প্রশাসনের উচ্চস্তরে তাঁরাই বহাল থাকেন যাঁরা ইতোপূর্বে ছিলেন পাকিস্তানী সামরিক জান্তার দোসর। শেখ মুজিব তাই পদে পদে প্রতারিত হন। তাঁর চতুর্দিক বেষ্টন করে থাকে চাটুকারের দল। গ্রীক ট্রাজেডির নায়কের মতো শেখ মুজিব ছাপ-ছাপ অন্ধকার সরিয়ে সন্ধান করেন আলোর ঠিকানা। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ-বিনির্মাণের প্রয়োজনে তিনি চান সোনার মানুষ। কিন্তু সোনার মানুষ নেই; আছে মেরুদণ্ডহীন, নপুংসক অথচ পরছিদ্রান্বেষী অসংখ্য মানুষ। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক এলাকা নিবেদন যোগ্য :

> ...ঘুরে ফিরে ঐ শেখ সাহেবের কথাই এসে পড়ে, ... ঐ যে উনি বলেন, সোনার বাংলা যে গড়বো, সোনার মানুষ দেন। সব মানুষ ভেজাল। সোনা দূরের কথা, রূপো-তামা, কাঁসা-পেতল, লোহা-দস্তা কিছু নয় সাহেব নিছক একেবারে বিষ, স্মাগলিং, আর বে-ইমানীর মধ্যে মিথ্যে কথার ভিয়ান চালিয়ে আমরা গড়া। নিজের ভাই-এর মুখের গ্রাস, রোগের ওষুধ, শিশুর দুধ, চুরি করে নিজে মাথায় বয়ে নিয়ে দেশের বাইরে পার করে দি। ... পার করে দেবার পর দোষ চাপিয়ে দি ভারতীয়দের মাথায়। এবং নিজে একদম ভালো

মানুষ সেজে পাছার লুঙ্গি তুলে ধেই ধেই করে নেচে গেয়ে বলি, সালার দেশটা হলো কি সাহেব, হলো কি। সরকার একেবারে অপদার্থ, করে কি! লজ্জা-ঘৃণা-ভয় কিচ্ছু নেই আপনাদের—আমাদের। ঐ লুঙ্গি-তোলা পাছার উপরে দগদগে পোড়া লোহার দাগ দেয়না কেন সরকার। এই দয়াইতো তার দোষ।[৮০]

এভাবেই সরদার জয়েনউদ্‌দীন গণমানুষের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তাঁর বলার ভঙ্গিতে পরিহাস-চটুলতা আছে বটে, কিন্তু তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে তাঁর অনুভব ও বেদনাকে শিল্পায়িত করে পরিবেশন করেছেন এ-উপন্যাসে।

আট

উপর্যুক্ত ছয়টি উপন্যাসের আলোচনাসূত্রে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সরদার জয়েনউদ্‌দীন জনজীবনমূল থেকে তাঁর উপন্যাসের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। যে-সমস্ত উপন্যাস-পাঠক দেশাত্মবোধের অঙ্গীকারে ঋদ্ধ, তাঁরা সরদার জয়েনউদ্‌দীনের উপন্যাসে নিঃসন্দেহে খুঁজে পাবেন তাঁদের বাঞ্ছিত উপাদান। শিল্প যে শুধু আনন্দের সামগ্রী নয়, সমাজশোধনের অন্যতম মাধ্যমও তা' তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন এবং সে-অনুসারে তিনি তাঁর উপন্যাসের ঘটনা নির্মাণ করেছেন। বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে ব্যক্ত করবার মতো শিল্প-শক্তি তাঁর ছিলো কিনা সে-বিবেচনায় না গিয়ে আমরা এ-কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তিনি ছিলেন সামাজিক অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ অথচ প্রচারবিমুখ একজন সাহিত্যকর্মী। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র সৃজন করেছেন; সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাসকে পরিবেশন করেছেন প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে।[৮১]

উৎস-নির্দেশ

১ সরদার জয়েনউদ্‌দীনের প্রথম উপন্যাস 'আদিগন্ত' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। ইতোপূর্বে প্রকাশিত তাঁর তিনটি গল্পগ্রন্থ হচ্ছে 'নয়ানচুলি' (১৯৫২), 'বীরকণ্ঠির বিয়ে' (১৯৫৫) এবং 'খরস্রোত' (১৯৫৫)

২ মনসুর মুসা, 'পূর্ব বাঙলার উপন্যাস', পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ৬৫

৩ সরদার জয়েনউদ্‌দীন, 'আদিগন্ত', মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৭৫, পৃ. ১

৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৫ পূর্বোক্ত

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১১

৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

১২ পূর্বোক্ত পৃ. ৯৭

১৩ পূর্বোক্ত পৃ. ১৫২

১৪ পূর্বোক্ত

১৫ বিশ্বজিৎ ঘোষ, "বাংলাদেশের উপন্যাস," 'সাহিত্য পত্রিকা', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, অষ্টাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৯১ পৃ. ১৪৯

১৬ সরদার জয়েনউদ্‌দীন, 'পান্নামোতি', ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৩৭১, পৃ. ৪-৫

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৬

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

২২ পূর্বোক্ত

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

২৭ সৈয়দ আকরম হোসেন, "বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ", 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ. ১১

২৮ সরদার জয়েনউদ্দীন, 'ভূমিকাংশ', 'অনেক সূর্যের আশা', বইঘর ।। চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪

২৯ সরদার জয়েনউদ্দীন, 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ', আদিল ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোঃ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫, পৃ. ২০১

৩০ সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৩১ 'অনেক সূর্যের আশা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২

৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-২৮

৩৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

৩৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৪০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৪১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

৪৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

৪৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২

৪৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

৪৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-১০২

৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

৫০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

৫১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪

৫২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮

৫৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩

৫৪ সরদার জয়েনউদ্‌দীন, 'ভূমিকাংশ', 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ', পূর্বোক্ত।

৫৫ অল্পদর্শী, "বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা", 'দৈনিক সংবাদ,' ঢাকা, সোমবার ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫, পৃ. ৪

৫৬ 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৫৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২১

৫৮ ধনঞ্জয় দাস, 'আমার জন্মভূমি: স্মৃতিময় বাংলাদেশ', মুক্তধারা, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১২-১৩

৫৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৬০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

৬১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩-৮৪

৬২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৬৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

৬৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

৬৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৬৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

৬৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩

৬৮ ধনঞ্জয় দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩ -১১৪

৬৯ 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬

৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৭

৭১ পূর্বোক্ত।

৭২ সরদার জয়েনউদ্‌দীন, 'বেগম শেফালী মীর্জা', মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ১৯৭৪, পৃ. ১১-১২

৭৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৭৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

৭৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

৭৬ সরদার জয়েনউদ্‌দীন, 'শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলি', এভারনিউ প্রেস, ঢাকা, আশ্বিন ১৩৮০, পৃ. ৬-৮

৭৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৭৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯

৭৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

৮০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৮১ "বিদ্রোহমুখর অতীত থেকে আপন কালস্থিত ক্ষুব্ধ সময়ের বিস্তৃত সীমায় গ্রাম ও নগর উভয় পটভূমিতেই তিনি জীবনের বিকাশ, বিলাস, বিকার ও বিনাশকে চিত্রিত করে গেছেন।" সরদার আবদুস সাত্তার, "কথাশিল্পী সরদার জয়েনউদ্‌দীন," 'উত্তরাধিকার', সম্পাদক : আবু হেনা মোস্তফা কামাল ।। নির্বাহী সম্পাদক : রশীদ হায়দার, বাংলা একাডেমী, ১৬শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা জানুয়ারী---মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১১